স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ৫ সংখ্যা।। ১০ সেপ্টেম্বর - ২০১২।। ২৪ ভাদ্র - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

দেশজুড়ে এক নৈরাজ্য চলছে, নেতা-নেত্রীরা হয় চোর নয় প্রতারক □ ৯

সূর্যকান্তের সময় আসন্ন? □ ১০

খোলা চিঠি : জোট বড় জ্বালা, কান ঝালাপালা □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

কংগ্রেস দলের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা : কংগ্রেসে অব্যাহত পরিবারতন্ত্র □ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১২

দুর্নীতি ও কেন্দ্রীয় সরকার □ অমলেশ মিশ্র □ ১৪

কংগ্রেসের দেশ সেবা মানে 'মাল কামানো' □ দেবব্রত চৌধুরী □ ১৬

কয়লা দুর্নীতি : কেন মনমোহনের সরে যাওয়া উচিত □ তারক সাহা □ ১৮

খড়ার মন্দির □ ডঃ প্রণব রায় □ ২১

মরিশাসের মানুষ দেখা হলেই বলবে 'রাম রাম' □ বালেন্দু শর্মা দাধীচ □ ২২

বেণীপ্রসাদ উবাচ : 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে আমি খুশি' □ শ্যামল কুমার হাতি □ ২৭

বংশানুক্রমিক শাসন ও জাতপাত : গণতন্ত্রের মৃত্যুঘন্টা □ এম ভি কামাথ □ ২৮

নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ এরাজ্যকেও অসমের মতো বারুদের স্তূপে পরিণত করেছে □ একলব্য রায় □ ৩০

সাক্ষাৎকার : বদরুদ্দিন আজমল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে ভারতে : হাগ্রামা মহিলারি □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৭ □ □ রঙ্গম : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

দুর্নীতিগ্রস্ত ইউ পি এ - পৃঃ ১৪-১৮

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ২৪ ভাদ্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১০ সেপ্টেম্বর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

বার্ষিক গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ আবেদন

ডাকযোগে যাঁরা স্বস্তিকা নেন, তাঁরা প্রতি কপির উপরে কাগজে লেখা গ্রাহক নম্বর এবং মেয়াদ শেষের তারিখ দেখে সেই অনুসারে মেয়াদ শেষের এক মাসের মধ্যে মনিঅর্ডার কিংবা অন্য উপায়ে পরবর্তী বছরের নবীকরণের জন্য গ্রাহক মূল্য পাঠিয়ে রসিদ সংগ্রহ করবেন। পুরনো গ্রাহকরা অবশ্যই গ্রাহক নম্বর লিখে পাঠাবেন। যদি কোনও কারণে নবীকরণ করা সম্ভব না হয় তাও সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে জানাবেন। নতুনদের ক্ষেত্রে পুরো নাম-ঠিকানা (পিন সহ) ও টাকা পাঠিয়ে রসিদ নেবেন।

যাঁরা এজেন্টদের মাধ্যমে স্বস্তিকা পেয়ে থাকেন, তাঁরা তাঁদের বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদের তারিখ এজেন্টের কাছে জেনে নিয়ে এক মাসের মধ্যে এজেন্টের মাধ্যমে নবীকরণের টাকা জমা করে তার মাধ্যমেই রসিদ সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে নবীকরণ সম্ভব না হলে এজেন্টদের মাধ্যমে কার্যালয়ে জানাবেন। পুনরায় যখন গ্রাহক মূল্য জমা দেবেন সেই সময় থেকে পত্রিকা আবার চালু করা হবে। এজেন্টের সঙ্গে সবদিক থেকে সহযোগিতা ও যোগাযোগ রাখতে পারলে ভালো। সর্বত্রই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। আপনার নিকটবর্তী এজেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য তার ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখা ভালো। উল্লেখ্য, স্বস্তিকা থেকে এজেন্টকে গ্রাহকদের তালিকা পাঠানো হয়ে থাকে।

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় :

সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন

মুর্শিদাবাদের আহিরনে দরিদ্র হিন্দু কৃষকের জমি দখল করে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস তৈরি করার প্রচেষ্টায় রয়েছেন তাঁরা, যাঁরা একদা সিঙুর-নন্দীগ্রামে জমি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আজ ক্ষমতার সিংহাসনে।

একসময় বর্তমান ক্ষমতাধারীদেরই স্নেহধন্য, অধুনা রাজনৈতিক কারণে চক্ষুশূল, একজন আই পি এস অফিসার হিন্দুদের কাছ থেকে কীভাবে সবকিছু দখল করতে হবে তারই বয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন 'মুসলিমদের করণীয়' বইটিতে।

সব মিলিয়ে এহেন সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে উত্তপ্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আবহ। এ দুটি বিষয় নিয়েই এবারের বিশেষ বিষয়।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চৌরচূড়ামণি

'হাতে কালি মুখে কালি, তেহেরানে পালিয়ে গেলি' সংসদ ভবনে এই ধ্বনি চলিতে থাকিলেও চোর কিন্তু নিশ্চিন্তেই রহিয়াছে। কারণ সকলেই জানেন, এই দেশে চোরকে শাস্তি দেওয়া এবং কুকুরের ল্যাজ সোজা করা একই বিষয়। সকলেই অবগত আছেন ইউ পি এ সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি কিভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ একের পর এক দুর্নীতি প্রকাশ হইতেছে। ইউ পি এ সরকার ও দুর্নীতি আজ সমার্থকশব্দ। কিন্তু এই নিয়ে সরকারের কোনও হেলদোল দেখা যায় নাই। ইহার পূর্বেও সংসদ কেনাবেচা, স্পেকট্রাম দুর্নীতি প্রভৃতি নানা কেলেঙ্কারিতে কংগ্রেস দলের মুখে কালি পড়িয়াছে। আজ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার আশু পদত্যাগের দাবি করিয়া বিরোধীরা যে আন্দোলন জারি রাখিয়াছেন তাহাতেও প্রধানমন্ত্রী বিচলিত হন নাই। কারণ তিনি জানেন শত অপরাধ করিলেও, জনগণ তাঁহার প্রতি শত বিরূপ হইলেও তিনি ধোয়া তুলসী পাতা সাজিয়া সংসদ আলো করিবেন। দুর্নীতিতে জড়িত থাকিলে সমস্ত মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেই নিয়ম একইরকম হওয়া উচিত। টুজি স্পেকট্রাম বন্টন দুর্নীতির দায়ে কারাগারে ছিলেন প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজা। কিন্তু নিজে দুর্নীতির পাণ্ডা হইয়া তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য। একজন চরম অপদার্থ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী বলিয়া মানুষ এখনও সম্মান করিতেছেন। এ রাজার মতো যাহার এখন কারাগারে থাকা উচিত ছিল তিনিই এখন আন্না হাজারে বাবা রামদেবের সততা লইয়া জ্ঞান বিলাইতেছেন। এযাবৎ টুজি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিকেই দেশের সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেঙ্কারি হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। কিন্তু সি এ জি রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর দেখা যাইতেছে কয়লা খাদানের ব্লক বন্টন কেলেঙ্কারি তাহাকে ছাপাইয়া গিয়াছে। সি এ জি-র সাম্প্রতিক রিপোর্টে অভিযোগ করা হইয়াছে, অন্যায্যভাবে কয়লা খাদানের ব্লক বন্টন করিবার ফলে সরকারের ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হইয়াছে। টুজি স্পেকট্রাম বিলিতে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকার মতো। কয়লা কেলেঙ্কারিতে প্রধানমন্ত্রীর দিকে সরাসরি আঙুল উঠিয়াছে। কেননা ইউপিএ সরকারের দু'দফাতেই কয়লাদপ্তর বেশিরভাগ সময়ই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের জিম্মায় ছিল। এর পরেও যদি বলা হইতে থাকে মনমোহন একজন সৎ ব্যক্তিত্ব, একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা তাহা হইলে উন্মাদেও অবাক হইবে।

সাংবিধানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রধান বা নেতা। তাঁহার নেতৃত্বে ও নির্দেশে বিভিন্ন মন্ত্রীরা তাঁহাদের প্রতি ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করেন। মন্ত্রিসভার সাফল্য ও ব্যর্থতার দায় এজন্যই প্রধানমন্ত্রীর উপরই বর্তায়। তাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনও কেলেঙ্কারিতে যুক্ত না থাকিলেও সহকর্মী তথা মন্ত্রীদের অপকর্মের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই সরল বিষয়টি জানেন না তাহা নহে। আর এইক্ষেত্রে তো তিনি নিজেই দায়ী। তাহার দিকে আঙুল ওঠায় দেশের মাথাও হেঁট হইয়াছে। দেশের মাথা হইতে কলঙ্কের বোঝা মুক্ত করিবার একমাত্র উপায় প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমার মতে পাশ্চাত্য জাতি অধিকতর নিষ্ঠুর, প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিগণ সর্বভূতের প্রতি অধিকতর করুণাসম্পন্ন। তাহার কারণ শুধু এই যে, প্রাচ্যের তুলনায় আপনাদের সভ্যতা খুবই আধুনিক। কোনও স্বভাবকে দয়াবৃত্তির প্রভাবে আনিতে কিছু সময়ের আবশ্যক। আপনাদের শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু যে পরিমাণে শক্তি-সংগ্রহ চলিয়াছে, সেই পরিমাণে হৃদয়ের শিক্ষা চলে নাই, বিশেষতঃ মনঃসংযমের শক্তিও খুব অল্প পরিমাণেই অনুশীলন করা হইয়াছে। আপনাদিগকে সাধু ও ধীরপ্রকৃতি করিতে অনেক সময় লাগিবে। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে এই ভাব প্রবাহিত। যদি আমি ভারতের কোনও গ্রামে গিয়া সেখানকার লোককে রাজনীতি শিখাইতে চাই, তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু যদি তাহাদিগকে বেদান্ত উপদেশ করি, তাহারা অমনি বলিবে, 'হাঁ স্বামিন্, এখন আপনার কথা বুঝিতেছি—আপনি ঠিক বলিতেছেন।' আজ পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র সেই বৈরাগ্য বা অনাসক্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখন খুবই পতিত, কিন্তু এখনও বৈরাগ্যের প্রভাব এত অধিক বিদ্যমান যে, রাজা-রাজড়া পর্যন্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিনা সম্বলে দেশের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকারোক্তি

দিল্লীতে প্রভাব বাড়ছে মাওবাদীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৩০ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে এই প্রথম স্বীকার করে নিল নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী) দিল্লীর বুকে যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তা গভীর উদ্বেগজনক। সরকারি তথ্য বলছে দিল্লীতে ন'টির মধ্যে সাতটি জেলাই মাওবাদী প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন ওই সাতটি জেলা হলো মধ্য দিল্লী, নতুন দিল্লী, দক্ষিণ দিল্লী, উত্তর-পশ্চিম দিল্লী, দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লী, উত্তর দিল্লী এবং উত্তর-পূর্ব দিল্লী। খোদ রাজধানী শহরেই এহেন মাও বাড়বাড়ন্তে কেন্দ্রের মাও-দমন নীতিই নতুন করে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। বিশেষত নয়াদিল্লীর মতো জায়গায় যেখানে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তর ও ভবন রয়েছে সেখানে মাও-প্রভাব বৃদ্ধি নিরাপত্তার কপালে ভাঁজ ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

রাজ্যসভায় লিখিত বিবৃতি-তে জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, "২০১১-য় দেশের ৮৪টি জেলা মাওবাদী নৃশংসতার সাক্ষী থেকেছে। এই মাওবাদীরা মূলত সিপিআই (মাওবাদী) গোষ্ঠীর। উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও দেশের আরও ৫০টি জেলা মাও-হামলার শিকার হয়েছে।" শ্রী সিং জানিয়েছেন, সিপিআই (মাওবাদী) সহ অন্যান্য মাও-গোষ্ঠীর নৃশংস হামলার ওপর ভিত্তি করেই মাওবাদী প্রভাবাধীন জেলাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, ২০১১-য় এরকম মাও-প্রভাবাধীন জেলার সংখ্যা ছিল ২০৩ (যার মধ্যে ওই ৮৪টি জেলাও রয়েছে)।

এর পাশাপাশি গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, মাওবাদীদের প্রকাশ্য সংগঠনগুলি রাজধানীর শিল্পাঞ্চলে তাদের কার্যকলাপ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর এবং গুজরাটেও তাদের সংগঠনকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে অচিরেই দেশের অর্থনীতির ওপর বড়সড় আঘাত হানতে পারে মাওবাদীরা বলে আশঙ্কা কেন্দ্রের। বিশেষত রাজধানীর রিয়েল এস্টেট ব্যবসাতেও মাও-বিনিয়োগ রয়েছে বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। শহুরে এলাকায় সংগঠন বৃদ্ধি করতে সিপিআই (মাওবাদী) অনেকটা কলকাতার ধাঁচেই তাদের পেটোয়া বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগিয়ে জনমত গঠন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ। ২০০৯-এ নতুন দিল্লী থেকে কোবাড ঘ্যান্ডিকে গ্রেপ্তার এবং এ বছরের গোড়ায় কৃতী ইঞ্জিনিয়ার রামকৃষ্ণ সাদানালাকে পুলিশি গ্রেপ্তারের পর স্পষ্ট হয়েছে দেশবিরোধী কাজে দেশের তরুণ মেধাকে ব্যবহার করতে চাইছে মাওবাদীরা। তারা বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নামে সামাজিক ভিত্তি বাড়াতে চাইছে এবং

কোবাড ঘ্যান্ডী

রামকৃষ্ণ সাদানালা

পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বিদেশী মদতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের ও দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সক্রিয় হতে মদত দিচ্ছে। মাও-কৌশলের এই পুরোটাই গোয়েন্দা রিপোর্টে স্পষ্ট। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মাওবাদীরা তাদের প্রকাশ্য সংগঠনের মাধ্যমে প্যামফ্লেট, লিফলেট ইত্যাদি বিলি করে জনভিত্তির প্রসার এবং পরবর্তী পর্যায়ে মানুষকে খেপিয়ে তুলে স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে ও ধর্না ইত্যাদি বিক্ষোভমূলক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়েছে। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে মাও আঁতাতের কথা এখন আর গোপনীয় নয়। বিশেষ করে চীনের ইউনান প্রদেশসহ অন্যান্য প্রতিবেশি রাষ্ট্র থেকে মাওবাদীদের মাধ্যমেই চোরাপথে অস্ত্রের লেনদেন হচ্ছে উত্তর-পূর্বের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে। শ্রী সিং একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিসংখ্যান উল্লেখ করে দেখিয়েছেন ২০০৯ থেকে ২০১১— এই ক'বছরে মাও-অধ্যুষিত পশ্চিম মেদিনীপুরে যেখানে মাওবাদী হামলায় মৃতের সংখ্যা ছিল ৩৬০, সেখানে এবছর ৩১ জুলাই অবধি কোনও মাও-নাশকতার খবর নেই। একইভাবে ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় ওই তিন বছরে মাও নাশকতায় মৃতের সংখ্যা ছিল ২৮০, সেখানে এবছরের প্রথম ৭ মাসে সেই সংখ্যা মাত্র ১৩। এভাবেই অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে মাও-নাশকতার সংখ্যা কমেছে। মাওবাদীদের নতুন কৌশল সামনে আসতেই তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে, শুধু দুর্গম এলাকায় মাঝেমধ্যে অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা থেকে সরে এসে বড় মাপের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য দেশের রাজধানী দিল্লীসহ গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী শহরগুলিকেই বেছে নিয়েছে মাওবাদীরা। দিল্লীতে মাও-প্রভাব বৃদ্ধি তারই ইঙ্গিত বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা। ▯

অসমের পুনরাবৃত্তি রুখতে পুলিশি অভিযান মণিপুরে

সংবাদদাতা ॥ অসমের মতো অবস্থা যাতে সেই রাজ্যে না ঘটে তার জন্য মণিপুর পুলিশ ৬০টি দলে ভাগ হয়ে দুটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অবৈধ অভিবাসীদের সন্ধানে ব্যাপক তল্লাসী চালায়। গত ৩১ আগস্ট রাত দুটো নাগাদ পুলিশ এই অভিযান শুরু করে ১৫০ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে। ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম এবং লিলং পুলিশও এই অভিযানে অংশ নেয়। পুলিশ লিলং ও হাট্টা গোলাপতি এলাকাতেও তল্লাসি চালায়। উল্লেখ্য, লিলং মুখ্যমন্ত্রী ও ইবোবি-র বিধানসভা কেন্দ্র থাউবল-এর অন্তর্গত। মণিপুরের এই এলাকাতেই সব থেকে বেশি মুসলিম বসবাস করে।

এই অভিযান রাতে করার কারণ হিসেবে এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের বক্তব্য হলো, এইসব এলাকার লোকেরা দিনেরবেলায় কাজের ধান্ধায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মণিপুরে এরা এসেছে প্রধানত ব্যবসা বা দিনমজুরী খেটে রোজগার করতে। ধৃতেরা প্রাথমিকভাবে ভোটার আই ডি কার্ড দেখিয়েছে। কিন্তু কে মণিপুরী আর কে মণিপুরী নয় তা তাদের কথাবার্তার ভাষা থেকে সহজেই বোঝা যায়।

মণিপুরের গৃহমন্ত্রী জি গাইকাহানগম (gaikhangam) অবশ্য জানিয়েছেন, এই অভিযানের সঙ্গে অসমের ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই। রাজ্যের আইন অনুসারে অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করে ফেরৎ পাঠানোই লক্ষ্য। এটা একটা রুটিনমাফিক কাজ। অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কারের ব্যাপারটা কেন্দ্র সরকারে হাতে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সেতুসমুদ্রম প্রকল্পটি আবার খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সেতুসমুদ্রম প্রকল্প নিয়ে আর কে পাচুরি প্যানেল রিপোর্টটি কেন্দ্র সরকার বাতিল করে পরিবর্তে সুপ্রীম কোর্টের প্রস্তাবিত 'অ্যালাইনমেন্ট ৪এ' (Alignment 4A)-এর বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য একটি নতুন কমিটি গড়ার কথা ভাবছে। যদি প্রয়োজন হয়, এই প্যানেল রামসেতুকে এড়িয়ে কোনও বিকল্প পথ চিহ্নিত করতে পারবে। ডি এম কে এবং হিন্দু ভাবাবেগের দোটানার মধ্যে পড়ে জাহাজ-মন্ত্রক অ্যালাইনমেন্ট ৪এ-এর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি নতুন প্যানেলের সুপারিশ করেছে যারা প্রকল্পটির জলবায়ু ও পরিবেশগত দিকগুলি খতিয়ে দেখবে এবং এইসব সমস্যা যতটা সম্ভব সমাধান করা যায় তার উপায় বাতলাবে।

প্রাপ্ত সূত্র অনুসারে ক্যাবিনেট কমিটি অন পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ারস (সিসিপিএ)-এ আলোচনার জন্য এই বিষয়টি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যদিও রসায়ণ ও সারমন্ত্রী এম কে আলাগিরি এখনও পর্যন্ত তাঁর দল ডি এম কে-র দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পর্কে কিছু জানাননি। সেতুসমুদ্রম সিপিং ক্যানেল প্রজেক্ট-এর লক্ষ্য হলো ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটি জাহাজ চলাচলের পথ তৈরি করা যা পক্‌প্রণালী ও মান্নার উপসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। এর ফলে ভারতের পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলে যেতে শ্রীলঙ্কাকে ঘুরে যেতে হবে না— এখন যেটা করতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ২০০৫-এর জুলাইতে এই প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্ট ৬-এর কাজ শুরু হয়। ঘটনা হলো, এই পথে সেতু তৈরি হলে তা রামসেতু ধ্বংসের কারণ হবে। খুব সঙ্গত কারণেই হিন্দুরা তাই বিকল্প পথ তৈরির দাবি জানায়। শেষপর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট এই কাজ স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেয় এবং অ্যালাইনমেন্ট-৪ অনুসারে বিকল্প পথ তৈরির প্রস্তাব দেয়।

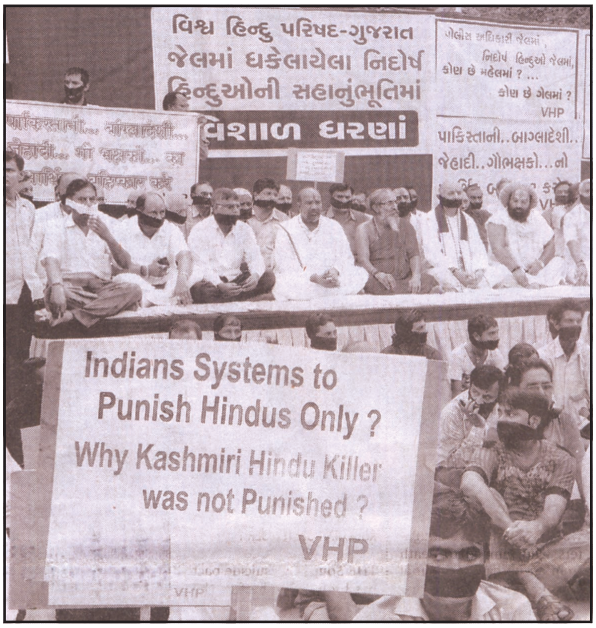

ভারতবর্ষের সাংবিধানিক পদ্ধতি কি কেবল হিন্দুদেরই শাস্তি দিতে পারে? কাশ্মীরের হিন্দু ঘাতকরা তবে শাস্তি পাচ্ছে না কেন? এমনই গুরুতর প্রশ্ন তুলে ডাঃ প্রবীণ তোগাড়িয়ার উপস্থিতিতে নারোদা পাটিয়া কান্ডের প্রতিবাদে গত ১ সেপ্টেম্বর আমেদাবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্মীদের মৌন অবস্থান হয়ে উঠল প্রতিবাদমুখর।

সংশোধনী

গত ৬ আগস্ট স্বস্তিকায় ধীরেন দেবনাথের বিশেষ রচনা 'ঈশ্বরকণা' (পৃঃ ৩৬) নিবন্ধে সত্যেন বোসের পাশে যে ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে তার নিচে লেখা হয়েছে 'হিসন'। আসলে সেটি হবে 'হিগস'। তাছাড়া 'সান ল্যাবরেটরি' হবে 'সার্ন ল্যাবরেটরি'। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

— *স্বঃ সঃ*

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সন্ত্রাসবাদীদের চারণভূমি হয়ে উঠেছে ব্যাঙ্গালোরের হুবলি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সন্ত্রাসবাদ ও হুবলির নাম কিছুদিন হলো সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লস্কর-এ-তৈবার ও হুজি-র সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৫ জনকে গত ২৬ আগস্ট গ্রেপ্তার করেছে হুবলি পুলিশ। উত্তর কর্ণাটকের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গণ্য হুবলিতে প্রথম আতঙ্কবাদের ছায়া দেখা যায় ২০০০ সালে। গদাগ রোডের একটি চার্চে বোমা বিস্ফোরণ দিয়ে এর শুরু। স্মরণে থাকতে পারে, ব্যাঙ্গালোরের এক বিশেষ আদালত ২০০৮ সালে হুবলি সহ বহু চার্চে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের দায়ে ২৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে। এই অপরাধীরা হায়দরাবাদের নিষিদ্ধ সংগঠন 'দিনদার আন্তুমানের' সদস্য বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত ২০০৮ সাল থেকেই সন্ত্রাসবাদের লালন ক্ষেত্র হিসাবে হুবলির নাম ছড়িয়ে পড়ে। মহম্মদ হাউস ওরফে রিয়াজউদ্দিন নামের এক সন্ত্রাসবাদী হায়দরাবাদ থেকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সেই ছিল দক্ষিণ ভারতে লস্কর-ই-তৈবার কম্যান্ডার। সংবাদে প্রকাশ, রিয়াজউদ্দিন বন্ধু হিসেবে হুবলীর আয়ুর্বেদিক কলেজের ৫ম বর্ষের ছাত্র আসাদুল্লা আবু লস্করকে জুটিয়ে নেয়। এর পরই দু' জনে মতলব করে কে আই এন এস মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র মহম্মদ আসিকের সঙ্গে বৃহত্তর চক্রান্তে লিপ্ত হয়। অবশ্য সৌভাগ্যের কথা তারা তিন জনই পরবর্তীকালে পুলিশের জালে ধরা পড়ে। পুলিশি জেরায় জানা যায় তারা প্রায়ই সংলগ্ন জঙ্গলে মিলিত হয়ে সন্ত্রাসের ছক কষত। সংবাদসূত্র অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদীদের হুবলিকে বেছে নেওয়ার পেছনে প্রধান কারণ অবস্থানগত সুবিধে। হুবলির পশ্চিমে মহারাষ্ট্র ও গোয়া এবং পূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশ হওয়ায় আগমন ও নির্গমনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সুবিধের জায়গায় অবস্থিত। সঙ্গে বাড়তি রয়েছে হুবলি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ জঙ্গল। তাই হুবলি থেকেই সন্ত্রাসবাদ মধ্য ব্যাঙ্গালোরের অন্যান্য এলাকাতেও ডানা মেলেছে। সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরের পুলিশ কমিশনার বি জি জ্যোতিপ্রকাশ মির্জি জানাচ্ছেন যে শহরের ব্যস্ততম 'ম্যাজেস্টিক' এলাকা থেকে ১ সেপ্টেম্বর ধরা পড়া মহম্মদ আক্রম ওরফে খালিদ (২২)-এর কাছে থেকে একটি ৭.৬৫ এস এম পিস্তল, ১৬টি কার্তুজ ও অন্যান্য বিস্ফোরক তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র পাওয়া গেছে। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এই অপরাধী সৌদি আরবে এক বছর কাটিয়ে ভারতে ঢুকেছে। কিছুদিন হলো সে বাঙ্গালোরে ডেরা গেড়েছে। পুলিশি তথ্য অনুযায়ী তারা ব্যাঙ্গালোর ও তার আশপাশে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা করছিল।

২০০৮-এ বিস্ফোরণে ছত্রভঙ্গ হুবলি আদালতের অন্দরমহল। (ফাইল চিত্র)

এদিকে হুবলিতে পুলিশি তৎপরতার ফলে সঙ্গীসাথীদের পাকড়াও হওয়ার খবর পেয়ে আক্রম আত্মগোপনে চলে যায়। সে শহর ছেড়ে পালাবার মতলবেই ছিল। কিন্তু তার আগেই পুলিশি জালে ধরা পড়ে। হুবলি ও বাঙ্গালোর সফরে সক্রিয় হয়ে ওটা চক্রের হুবলিতে ৫ জন ও বাঙ্গালোরে ৬ জন পরপর গ্রেপ্তার হওয়ায় সন্ত্রাসবাদী মহলে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে বলেই পুলিশি অভিমত। কমিশনার মর্জির বক্তব্য অনুযায়ী ১২নং সন্দেহভাজন আতঙ্কবাদীটি গ্রেপ্তার হয়েছে হায়দরাবাদ থেকে। গ্রেপ্তার হওয়ার সময় তার হেফাজত থেকে পুলিশ একটি ৭.৬৫ এম এস ইতালীয় ব্র্যান্ডের পিস্তল উদ্ধার করেছে।

এই সংক্রান্ত সবচেয়ে বিস্ফোরক তথ্যটি উঠে এসেছে ব্যাঙ্গালোরের এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তার কথায়। তিনি বলেছেন, ধর-পাকড়ের সংখ্যা খুব শীঘ্রই আরও বাড়বে যার মধ্যে এই রাজ্য তো বটেই অন্য রাজ্যেরও সংবাদ মাধ্যমের কিছু কেষ্ট-বিষ্টু থাকতে পারেন। সন্ত্রাসবাদীদের এই জাল বিপুল ও বহুধাবিস্তৃত বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে। সেই মর্মে এই সমস্ত ব্যক্তির খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের কাজেও কোনও ঢিলেমি দেওয়া হচ্ছে না। গেড়ে বসা আতঙ্কবাদীদের কব্জায় আনতে ব্যাঙ্গালোর পুলিশ গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজনদের নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই হুবলি গিয়ে যৌথ জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা নিয়েছে বলে তথ্যে প্রকাশ। সব মিলিয়ে কর্ণাটক পুলিশ এবার বজ্র আঁটুনির দিকেই এগোচ্ছে।

দেশ জুড়ে এক নৈরাজ্য চলছে; নেতা-নেত্রীরা হয় চোর, নয় প্রতারক

গূঢ়পুরুষের কলম

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিটি জনসভায় নিয়মিতভাবে সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসকদের কী করণীয় এবং কী করা উচিত নয়, সে সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। মমতা সাধারণভাবে এই তিনটি পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের টার্গেট করেছেন, কারণ এই সব পেশার অধিকাংশরাই তাঁদের জীবনধারণের জন্য ডান-বাম কোনও রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেন না। কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারকে সম্পূর্ণ অকারণে দলবল নিয়ে হেনস্থা করেছিলেন মমতা। তখন তিনি সদ্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। নিজেকে জনদরদি রাজনীতিক বলে প্রচার করতে তিনি তখন প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শন শুরু করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে থাকতো একটি বা দুটি 'চিট ফান্ডের' পরিচালিত বাংলা টিভি চ্যানেলের তল্পিবাহক লোকজন। এদের কাজই হচ্ছে নেত্রীকে বাংলার এক নম্বর সমাজসেবী দিদি বলে প্রচার করা। এখন রাজ্যবাসী জেনে গেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারের নামে নির্লজ্জ স্তাবকতা পছন্দ করেন। নেত্রী সেদিন দক্ষিণ কলকাতার বাঙুর হাসপাতালে গিয়ে সুপারকে এক ঘর লোকের সামনে অযথা অপমান করেন। টিভি-র মেগা সিরিয়ালের স্টাইলে মুখ্যমন্ত্রীর সেদিনের অ্যাকটিং টিভি-র পর্দায় 'লাইভ' দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলার মা-মাটি-মানুষ। একজন পদস্থ সরকারি হাসপাতালের সুপারকে টিভি ক্যামেরার সামনে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী অশালীনভাবে ধমকাচ্ছেন এমন দৃশ্য বলিউডের সিনেমার গল্পেই দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর তর্জন গর্জনের সামনে ভয় পাননি আত্মবিশ্বাসী সেই চিকিৎসক। নত মস্তকে মহাকরণে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতেও যাননি তিনি। বদলে তিনি মহাকরণে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিশিষ্ট এই শল্য চিকিৎসক বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পিছনে পিছনে ঘোরার বদলে রোগীর চিকিৎসাটাই তাঁর প্রথম কর্তব্য। ঠিক কথাই তিনি বলেছিলেন। অথচ এই সাহসী মানুষটির পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। কলকাতার রাজপথে মোমবাতি হাতে কেউ হাঁটেননি। চিকিৎসকদের সংগঠনগুলি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ, এই স্বাধীনচেতা মানুষটি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। যদিও মমতার স্তাবকেরা তাঁকে সি পি এম দলের খাস লোক বলে মিথ্যা প্রচার করেছিল। যেমন, বেলপাহাড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় সারের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কথা বলার অপরাধে দরিদ্র প্রান্তিক চাষি শিলাদিত্য চৌধুরীকে স্বয়ং মমতা 'মাওবাদী' তক্‌মা লাগিয়ে পুলিশকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনীতিতে গণতন্ত্র, সংবিধান ইত্যাদির কোনও স্থান নেই। যা চলছে তাকে স্বৈরাচারী রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী যা বলবেন তাহাই সত্য, বাস্তবে ঘটে যা তা সত্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি তাঁর উত্তরবঙ্গের জেলা সফরে গিয়ে পাড়ায় পাড়ায় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল গড়ে দিয়েছেন। রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য উত্তরবঙ্গে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে দিচ্ছেন। প্রতিটি জনসভায় ডজন ডজন প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়াচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পিছনে দাঁড়ানো রেলমন্ত্রী ইশারা করছেন, জোরসে তালি বাজাও। ভারতের এই নয়া রেলমন্ত্রীটির কাজকর্ম বোঝা ভার। তিনি দিল্লিতে রেল ভবনে যান না। চব্বিশ ঘন্টাই তিনি নেত্রীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ান। কেন? ব্যাপারটা যে আর নিছক রঙ্গ রসিকতার পর্যায়ে নেই, সে সম্পর্কে রেলমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী দু'জনেই অবহিত। তবু কু-দৃশ্যটি টিভির পর্দায় মা-মাটি-মানুষকে দেখতে হচ্ছে। একদা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ভদ্রলোক দিদি-র পিছনে দার্জিলিং থেকে দারভাঙ্গা সর্বত্র ঘুরতেন। কিন্তু ত্রিফলা আলো কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে গিয়ে এখন আর দিদির কাছে তিনি কলকে পাচ্ছেন না। প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী যদি রাজ্যের বাইরে যেতে না চান তবে তাঁকে রেলমন্ত্রীর পদ থেকে সরাচ্ছেন না কেন আমাদের মিস্টার ক্লিন প্রধানমন্ত্রী? কী করেই বা সরাবেন তিনি। নিজেই কয়লাখনি কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না। দেশজুড়ে এ এক অদ্ভুত নৈরাজ্য চলছে। নেতা-নেত্রীরা হয় চোর, নয় বুকনিবাজ প্রতারক। পশ্চিমবঙ্গে বিগত ৩৫ বছরে সি পি এম বুকনিবাজিকে আশ্রয় করে রাজ্যজুড়ে শিকড় ছড়িয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সি পি এম সৃষ্ট প্রতিশ্রুতির বুকনিবাজিকে শিল্পকর্মে পরিণত করেছেন। অথচ রাজ্যের শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই জানেন, যাঁরা সত্যি কাজ করেন, তাঁরা অত কথা বলেন না। নিজের ঢাক নিজে বাজান না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দেশের বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ নয়। টাকা দিয়ে বিচার কেনা যায়। এমন কথা কেউ বলবে না যে আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত। এমন কথাও সত্য যে, দুর্নীতি এখন ভারতের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় বিপদ। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রেই কমবেশি প্রশাসনিক দুর্নীতি চলে। ভারত কোনও ব্যতিক্রম নয়। এটি একটি সামাজিক রোগ। তবে এই রোগ যখন মহামারীর আকারে ছড়ায়, তখন কড়া দাওয়াই দিতে হয়। মমতা আলাদা করে শুধু বিচার বিভাগের দুর্নীতির কথা বললে তাকে মেনে নেওয়া যায় না। যেমন, সাংবাদিকরা লাখ টাকা খরচ করে দিদির ইমেজ নষ্ট করতে ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ করাচ্ছেন। কোনও সুস্থ মানসিকতার কেউ এমন দায়িত্বহীন অভিযোগ করতে পারে না। কিন্তু 'তিনি' পারেন। কারণ, তিনি জানেন তাঁর ঢাক পেটাবার লোকের অভাব নেই। তিনি জানেন, দেশের সংবিধান বিশেষ কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য সরকারি হাসপাতাল করার অনুমতি দেয় না। সরকারকে সবধর্মের মানুষের প্রতি সমান নিরপেক্ষতা নিয়েই কাজ করতে হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সব ধর্মের মানুষেরই প্রবেশাধিকার আছে। তাই শুধুমাত্র মুসলিম রোগীদের জন্য পৃথক সরকারি হাসপাতাল গড়া যায় না।

এই সহজ সরল কথাটি অভিজ্ঞ রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালভাবেই জানেন। তবু উত্তরবঙ্গের মুসলিম গরিষ্ঠ জেলায় সফরে গিয়ে প্রকাশ্য জনসমাবেশে প্রতিশ্রুতি দেন। এটা রাজনৈতিক দুর্নীতি ছাড়া অন্য আর কী বলা যেতে পারে? ❑

সূর্যকান্তের সময় আসন্ন ?

নিশাকর সোম

সিপিএম যখন বিরোধীনেতা সূর্য-কে ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে তখন খবরে প্রকাশ— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সূর্যর মন্ত্রিত্বের আমলের স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করছেন। প্রথম দফায় ৭৩ পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, সূর্যবাবু বেআইনিভাবে ১৮৪ কোটির টাকা দিল্লীর সংস্থাকে পাইয়ে দেন। ২০০৭ সালে মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড তৈরি হয়। সরকার শাসিত হলেও এই কর্পোরেশন স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতার অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হন সূর্যবাবু। তদন্ত কমিটি বলছে, এটা ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, কর্পোরেশন -এর ডিরেক্টরদের মনোনয়ন দেওয়ার কথা রাজ্যপালের। কিন্তু সূর্যবাবু নিজের মনমতো লোকদের নিয়ে আসেন ডিরেক্টর হিসেবে।

সংসদে প্রকাশ, তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সূর্যবাবুর আমলে চিকিৎসার সরঞ্জাম কেনার ব্যাপারে দুর্নীতি হয়েছে। যেমন বাজারের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে সরঞ্জাম কেনা হয়েছে। তার মধ্যে একটি ক্ষেত্রে ৮২ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৭২ টাকা এবং অন্যটির ক্ষেত্রে ৩২ লক্ষ ৮ হাজার ১১২ টাকা বেশি দেওয়া হয়েছে।

এসবই একটি বহুজাতিক সংস্থার কাছ থেকে কেনার ফল। বহুজাতিক সংস্থাটি এতই শক্তিশালী যে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সূর্যবাবুর কর্পোরেশন এই সংস্থাকে এ পর্যন্ত ৪৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৫৮ টাকা পেমেন্ট করে দিয়েছে। এরা কমিশনই পেয়েছে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১০ সালের ৬ অক্টোবর একটি বিদেশী সংস্থাকে সরঞ্জাম অর্ডার দিয়েছিল মেডিক্যাল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড। কিন্তু এই সংস্থা ২ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬০টি মাদার কেয়ার কিট এবং চাইল্ড কেয়ার কিট সরবরাহ করেনি। এরপরও এই সংস্থার বিরুদ্ধে সূর্যবাবুর কর্পোরেশন বা সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কেন?

সূর্যবাবুর বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রীর এন জি ও সম্পর্কেও অভিযোগ করে বলা হচ্ছে যে— সূর্যবাবুর ক্ষমতার প্রভাবে এই এন জি ও-তে বিদেশি সংস্থার পক্ষ থেকে বহু অর্থের ডোনেশন জমা পড়ে। উল্লেখ্য, এই এন জি ও সম্পর্কে স্বস্তিকা-র এই কলামে চার বছর আগে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। সূর্যকান্তবাবুর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটির ওই রিপোর্ট পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কাজে লাগাবে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, সিপিএমের যুবসংগঠনের রাজ্য সম্মেলনে পেশ করা প্রতিবেদনে বিগত বামফ্রন্টের মন্ত্রিসভার বহু ব্যর্থতা এবং নেতিবাচক সমালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এই যুব সংগঠনের সম্মেলন থেকে সংগঠনের সভাপতি সম্পর্কে প্রভূত সমালোচনা করা হয়েছে। নির্বাচিত সভাপতি সংগঠনের নিয়ম অনুযায়ী ৪০ বছর পার হয়ে গেলে আর সংগঠনে থাকতে পারবেন না। সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব এই নীতিকে নস্যাৎ করে দিয়ে ৪০ উর্ধ্ব বয়স হওয়া সত্ত্বেও সভাপতি পদে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ থেকে। এই বিষয়ে পার্টির মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন জেলা সম্পাদক তথা বর্তমানে পার্টির রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নৃপেন চৌধুরীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বলে সমালোচনা উঠেছে। বস্তুত সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বের বেশিরভাগ সদস্য নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। রবীন দেব গুরুতর অসুস্থ হওয়ার আগে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান না-পাওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন।

বুদ্ধবাবুকে সামনে রেখে যতই চেষ্টা হোক না কেন— পার্টিকে সচল করা সম্ভব হচ্ছে না। এই পৃষ্ঠপটে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। এরই প্রস্তুতি হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাইপো অভিষেক-কে রাজনীতিতে অভিষেক করিয়ে 'যুবা' নামে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি করেছিলেন।

যুবার সমাবেশে মমতা সংবাদপত্রের একাংশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ তুলে বলেছেন, 'পেইড নিউজ'। একথা অতীতে সিপিএমের নেতা বিমান বসু বলতেন। মমতার এই বক্তব্যের উত্তরে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তথা সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কাটজু এক সংবাদপত্রকে দেওয়া তাঁর প্রতিক্রিয়াতে বলেছেন— ''মমতার বক্তব্য একেবারেই ভিত্তিহীন শুধু নয়, এটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয়ও বহন করে। রাজ্যে ধর্ষণ এবং নারী নিগ্রহের খবর প্রকাশের দরুন সংবাদপত্রকে টাকা নেওয়ার অভিযুক্ত করেছেন— তাহলে তাঁর উচিত পাশাপাশি প্রমাণও দাখিল করা— নয়তো তিনি নিজেই মিথ্যা বলার দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছেন।'' আসলে মমতার এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে— যাঁরাই তার কর্মপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, সাধারণ মানুষ হোন কিংবা বিচার বিভাগ অথবা সংবাদমাধ্যম— তাদেরকেই অসৎ অথবা মাওবাদী আখ্যা দিয়ে থাকেন। নিজের শক্তিকে বাড়ানোর জন্য শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষমতা-কে ধ্বংস করার জন্য 'যুবা' নামে সংগঠনের জন্ম। মমতা বলেছেন, যুবা সোনার টুকরো ছেলে গড়তে স্কুল গড়ে দেবেন মমতা।

ট্রেন ইউনিয়নে হস্তক্ষেপ করে মমতা সুব্রত মুখার্জিকে সভাপতি এবং একজন নকশাল-কে সম্পাদক করে দোলা সেন অ্যান্ড কোং-কে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সমস্ত তৃণমূলী সংগঠনকে এক করার ব্যবস্থা নিচ্ছেন— এসবই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি। ছাত্র সংগঠনেও মমতা হস্তক্ষেপ করে যুবা অর্থাৎ সমীর চক্রবর্তীকে সামগ্রিক দায়িত্ব দিয়েছেন। সমীর চক্রবর্তীর স্ত্রী কৃষ্ণা চক্রবর্তী সল্টলেক পুরসভার চেয়ারপার্সন।

মুখ্যমন্ত্রী জেলা-সফরে যেসব প্রকল্প ঘোষণা করেছেন সে সম্পর্কে কংগ্রেসি সাংসদ দীপা দাসমুন্সির বক্তব্য 'এগুলি সবই কেন্দ্রীয় প্রকল্প।' আসলে এটা কংগ্রেস পরিবার-কে ভেঙে দেবার অভিযান এবং তাঁর সরকারকে গ্রামে এনে পঞ্চায়েত ভোটে বাজিমাৎ করতে চান মমতা— এটাই কংগ্রেসিদের একাংশের মন্তব্য।

এই সব সভাগুলিতে বাংলা পত্রিকার সাংসদ-সম্পাদক হাজির থেকে মুকুল রায়ের পাশে বসে নিজের গুরুত্ব জাহির করেছেন। সেখানে পার্থ চ্যাটার্জি তেমন গুরুত্ব জাহির করার সুযোগ পান কি? ▯

জোট বড় জ্বালা, কান ঝালাপালা

মাননীয় অধীর চৌধুরী,
সাংসদ, জাতীয় কংগ্রেস

কোথায় আছেন? বহরমপুরে না দিল্লীতে? সে আপনি যেখানে খুশিই থাকতে পারেন। কিন্তু ক'দিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে আপনার ঘাড়ে ফোঁস্‌স্‌স্ করে নিঃশ্বাস ছেড়েছেন তাতেই প্রশ্ন জাগল মনে।

রাজ্য সরকার যতই সরকারি অনুষ্ঠান বলে দাবি করুক আপনি ভালই জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই বহরমপুরে সভা করেছেন। লক্ষ্য ছিল আপনার খাস তালুকে ঘাসফুল পুঁতে দেওয়া। সেটা অনেকটাই হয়েছে বলেই কিন্তু মনে হচ্ছে।

পঞ্চায়েত ভোটে একলা লড়ার কথা প্রথম আপনিই বলেছিলেন। বারবার নিজে বলেছেন, অনুগামীদের দিয়ে বলিয়েছেন। তারপর একুশে জুলাই মমতাও বলে দিয়েছেন তাঁর একলা লড়ার সিদ্ধান্ত। তারপর প্রদেশ কংগ্রেসও। এবার কিন্তু শুধু মুর্শিদাবাদই নয়, গোটা চ্যালেঞ্জের মুখে আপনি। প্রদীপ ভট্টাচার্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সাংবাদিক সম্মেলন করে সাফল্যের দাবি জানাতে পারেন। কিন্তু ব্যর্থতার দায় কিন্তু মোটেও নেবেন না।

দেখুন অধীরবাবু, আপনি মুর্শিদাবাদের রবিনহুড। অবশ্য কেন রবিন হুড তা এই পত্র লেখকের একেবারেই অজানা। তবে বেশ কয়েকবার বহরমপুর শহরে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি সেখানে আপনার কথায় বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। কিন্তু আজকাল কি খাচ্ছে না? কেন খাচ্ছে না বলুন তো? বাঘের কি ঘাসে অরুচি ধরে গেল?

যাই হোক, আপনি অনেক সত্যি কথা অবলীলায় বলে দেন। সেজন্য আমার কিন্তু আপনাকে বেশ লাগে। এই যেমন আপনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসে একজনই পুরুষ আর সবাই মহিলা। তেমনি আপনাদের দলেও তো একজনই পুরুষ। না, আমি মহিলাদের ছোট করছি না। আপনিও নিশ্চয়ই করেননি। আমি জানি আপনি পুরুষ অর্থে বলতে চেয়েছেন নিয়ন্ত্রক। আর সেই হিসেবে আপনাদের দলেও তো গান্ধী পরিবারের পুত্রবধূর নির্দেশেই ওঠা, বসা, নাচা সব।

আপনি যখন রাজ্যে এবং কেন্দ্রে আপনাদের শরিকদলকে যা নয় তাই বলে গাল দেন তখন সবাই ভাবে এটা বুঝি আপনার দল-বিরোধী একক সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমি জানি, এখানেও দলনেত্রী ম্যাডামের নির্দেশে গলার শিরা ফোলানো হয়। আপনি গান ধরেন। আর রায়গঞ্জ থেকে দোহার দেন শ্রীমতী দাসমুন্সি। আপনাদের দু'জনকেই আমার সেলাম। কারণ, আপনারাই তো রাজ্য রাজনীতিটাকে জমিয়ে রেখেছেন। পুজোর পরই পঞ্চায়েত ভোটের ফাইনাল কাউন্ট ডাউন শুরু হবে। তখন বাগ্‌যুদ্ধ আরও জোরালো হবে। আরও মজা হবে। পাড়ায় কিংবা সরকারে শরিকি বিবাদের মতো রসালো বিনোদন যে আর কিছু হয় না।

সেই যখন বিধানসভা ভোটে আপনাদের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জোট হব হব তখন থেকেই শরিকি বিবাদ উপভোগ করছে রাজ্যবাসী। আমিও। মনে আছে এখন মমতা মন্ত্রিসভার বশংবদ মন্ত্রী সবংয়ের শায়েনশা ডাক্তার মানস ভুঁইয়ার সেকি তর্জন গর্জন। অসম্মানজনক জোট মানব না। কম আসনে লড়ব না। ওদিকে দাদা প্রণব মুখোপাধ্যায় মানে বর্তমানের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মশাই বোন মমতার হাত ধরে বলে দিলেন সকলই বোন তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী মমতা তুমি...

আপনি না হয় নিজের জেলার সাংসদ তথা আপনার প্রাতঃস্মরণীয় নেতার জোট উদ্যোগের বিরোধিতা করেননি কিন্তু চিল্লিয়ে গলা ফাটানোর পর মানসবাবু যখন মন্ত্রিসভায় ঢুকলেন তখন কেন জানি না কার্টুন ফিল্ম দেখছি মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি মানছি সেটা ভাবা একেবারেই ঠিক হয়নি। একজন মাননীয় নেতা তথা মাননীয় জনপ্রতিনিধি জনগণের স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে পাত্তা না দিয়ে শুধু মানুষ, মানুষ আর মানুষের কথা ভেবে যখন পুরনো কথা ভুলে সরকারে ঢোকেন তখন সেটাকে স্যালুট করা উচিত। হাসাহাসি করা তো-মোটেই উচিত নয়।

যাক, ধান ভাঙতে শিবের গীতে কাজ নেই। কিন্তু আপনি মানসবাবুদের পাশে নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন দেখে খুব খারাপ লাগল। মন্ত্রিসভায় থাকা আরও দুই কংগ্রেস নেত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, আবু হেনাকে পাশে নিয়ে যেভাবে সরকারকে গাল দিলেন তারপর কিন্তু সত্যিই ওই সরকারে আপনাদের একটি দিন থাকা মানে অনেক সময়।

মহাজাতি সদনে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের ওই সভায় আপনি একটা মারাত্মক অভিযোগ করেছেন। যদিও একজন কংগ্রেস নেতা হিসেবে ওটাকে 'ভূতের মুখে রাম রাম' বলা যায়। আপনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রদায়িক। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা করে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হোস্টেল বানিয়ে সংখ্যালঘুদের আরও বিচ্ছিন্ন করছেন। ইমামদের মাসিক ভাতা দিয়ে তাঁদের ধর্ম-ভাবনায় আঘাত করছেন। আরও দশ কদম এগিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক টানতেই এই কুচেষ্টা।

অধীরবাবু, আপনার এই বক্তব্য রাজ্যের প্রতিটি মানুষের মনের কথা। সবাই বুঝতে পারছে, বলতে পারছে না। আর এ কারণেই আপনাকে রাজ্যের নেতা বানানো যায়। কিন্তু সেটা হবে না। কারণ, এতকাল আপনি এবং আপনারা তো সেটাই করে এসেছেন। জনগণ যে এটাও বুঝেছে, ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসেছে বলেই আপনার এই 'ধর্ম-বিদ্রোহ'।

— *সুন্দর মৌলিক*

কংগ্রেস দলের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা

কংগ্রেসে অব্যাহত পরিবারতন্ত্র

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

এটা অনস্বীকার্য যে, কংগ্রেস দলের মধ্যে একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার ঝোঁক রয়েছে। এর শুরু অবশ্য অনেক আগে গান্ধী যুগেই। তাঁর আবির্ভাবের পর তাঁরই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— সেটা ছিল প্রায় তাঁর শেষ-জীবন পর্যন্ত। ১৯২১ সালে অসহযোগ

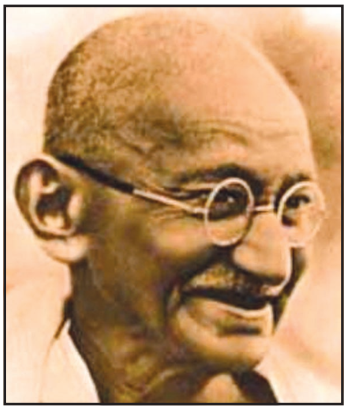

আন্দোলনের সময় তাঁকে কংগ্রেস 'ডিক্টেটর' বানিয়েছিল। আরও পরে পাঞ্জাবের কংগ্রেস-প্রতিনিধিরা তাঁর প্রসঙ্গে 'হিন্দুস্থানকা হিটলারকে জয়' স্লোগান দিয়েছেন। ১৯৩৯ সালে তাঁর সঙ্গে সমঝোতা না হওয়ায় কংগ্রেস- সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করতে হয়েছে, কারণ ১৯৩৪ সালে তিনি এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করলেও তিনিই প্রকারান্তরে থেকে গিয়েছিলেন তার প্রাণপুরুষ হিসেবে।

তারপর নেহরুকে নিয়ে এই দল ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েছে। তিনি একবার গান্ধীজী সম্বন্ধে বলেছিলেন, গান্ধীজী কংগ্রেস দলের 'permanent Super President।' কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন আরও বেশি কিছু। তিনি যেমন রাষ্ট্রপতিকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছেন, তেমনি কর্তৃত্ব করতে চেয়েছেন দল, ক্যাবিনেট ও পার্লামেন্টের ওপর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতালোভী মানুষ।

প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর খাপ খায়নি। তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনেক কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন যেমন, তেমনি রাষ্ট্রপতিও তাঁর হিন্দু কোড্ বিল্,

তিব্বত-নীতি, কেরালায় রাষ্ট্রপতি- শাসন জারী ইত্যাদি পছন্দ করেননি--- (সম্পাদকীয়, দ্য মডার্ন রিভিউ, মে, ১৯৭৮)। সেইজন্য সাংবিধানিক বাধা না থাকা সত্ত্বেও তিনি ডঃ প্রসাদকে দ্বিতীয়বার মনোনয়ন দিতে চাননি। আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ প্রবীণ নেতার চাপে তিনি ডঃ প্রসাদকে দ্বিতীয়বার মেনে নিলেও তৃতীয় দফায় তাঁকে আর চাননি। সেবার তিনি বেছে নিয়েছেন ডঃ রাধাকৃষ্ণানকে। মনে হয়, তাঁর ধারণা ছিল— এই বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক তাঁর বইপত্রে নিমগ্ন থাকবেন, অন্য কোনও বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে নির্দ্বিধায় স্বাক্ষর দেবেন ক্যাবিনেটের প্রস্তাবে। কিন্তু সেটা হয়নি। ডঃ রাধাকৃষ্ণানও এক ধরনের প্রত্যক্ষ ও প্রতিবাদী ভূমিকা (ডঃ জোহরীর ভাষায় 'critical role'— ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৬০৬) নিয়েছিলেন, বহু ব্যাপারে নেহরুর নীতি তাঁর পছন্দ হয়নি। নেহরু মনে হয় তাঁকে দ্বিতীয়বারের জন্য মনোনয়ন দিতেন না।

নেহরুর ক্যাবিনেট ছিল তাঁর পদানত প্রতিষ্ঠান। পার্সিভাল স্পীয়ার তাঁকে দেওয়ান-ই-আমের সঙ্গে তুলনা করেছে— (এ মর্ডান হিস্ট্রী, পৃ. ৪৩)। ভি বি কুলকার্ণী মন্তব্য করেছেন, নেহরু ক্যাবিনেটের দু-চারজনের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিতেন। সেটাই হোত ক্যাবিনেটের নীতি— (প্রসেস অফ ইন্ডিয়ান ডেমোক্র্যাসী, পৃ. ১৫৮)। আসলে, যৌথ দায়িত্বের নীতি গৃহীত হলেও নেহরুই ছিলেন ক্যাবিনেটের সর্বেসর্বা, ক্যাবিনেট ছিল তাঁর ছায়ামাত্র। বলা চলে— তাঁর নিজের নীতিই তিনি ক্যাবিনেটের মাধ্যমে চালিয়ে গিয়েছেন--- (মাইকেল ব্রেচার--- পলিটিক্যাল অ্যাক্সেশান ইন ইন্ডিয়া পৃ. ৯৫)।

বলা বাহুল্য, সব মন্ত্রী এটা মেনে নিতে রাজী হননি। তার ফলেই সর্দার প্যাটেল এক সময় পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। আর সম্মুখম চেট্টি, ডঃ জন্ মাথাই, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সি ডি দেশমুখ, কে সি নিয়োগী প্রমুখ মন্ত্রী বিভিন্ন সময় পদত্যাগ করেছেন। প্যাটেল তাঁকে লিখেছিলেন— সংবিধান অনুসারে ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব রয়েছে— সুতরাং প্রধানমন্ত্রী সমানদের মধ্যে অগ্রগণ্য বা সমান— 'primus inter pares।' উত্তরে নেহরু জানিয়েছিলেন যে, এই ব্যবস্থাতেও প্রধানমন্ত্রীর একাধিপত্য থাকে। ক্যাবিনেটে আলোচনা না করেই নেহরু বোম্বে রাজ্যকে দ্বিধাবিভক্ত করার কথা সংসদে ঘোষণা করেছিলেন। এতে সি ডি দেশমুখ বিরক্ত হওয়ায় নেহরু বলেছিলেন— এই অধিকার

প্রধানমন্ত্রীর আছে। সুতরাং বলা চলে— ক্যাবিনেটে তিনিই ছিলেন একাধিপতি। যৌথ দায়িত্বের সাংবিধানিক নীতিকে তিনি অস্বীকার করেছেন তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে।

তাঁর দলের ওপরেও তিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৪৯ সালে দলের সভাপতিত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন প্যাটেলপন্থী পুরুষোত্তম ট্যান্ডন ও নেহরুর প্রতিনিধি আচার্য কৃপালনী। তাতে ট্যান্ডন জয়লাভ করায় নেহরু অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। এম. চলাপতি রাউ লিখেছেন, 'The Struggle really was who would lead the Congress'— (জওহরলাল নেহরু, পৃ. ২০৫)। নেহরু কংগ্রেসীদের বলেছিলেন— দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার জন্য। তার ফলে ট্যান্ডন পদত্যাগ করেন। নেহরু তখন নিজেই কংগ্রেস-সভাপতি হন, যদিও কংগ্রেসের সংবিধানে একজনের দুটো পদে থাকা নিষিদ্ধ। ১৯৪৪ সালে তিনি ধেবরকে ওই পদে অধিষ্ঠিত করে সরে যান এবং আমৃত্যু নিজেই ঠিক করেছেন কে সভাপতি হবেন। বলা বাহুল্য 'All future incumbents of the post until his death owed there position to Nehru's good will'— (রজনী কোঠারী— পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ১৬৯)।

নেহরু তাঁর দলের আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়েছেন পার্লামেন্টেও প্রাধান্য বিস্তারের জন্য। তাঁর সময় লোকসভায় তাঁর দলের অবস্থাটা লক্ষ্য করা যাক—

সাল	মোট আসন	কংগ্রেস
১৯৫২	৪৮৯	৩৬৪
১৯৫৭	৪৯৪	৩৭১
১৯৬২	৪৯১	৩৪৮

রাজ্যসভাতেও কংগ্রেসের বিপুল গরিষ্ঠতা ছিল। তার ফলে নেহরুর পক্ষে পার্লামেন্টকেও বশে রাখার সুযোগ ঘটেছিল।

ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন আরও বেশি ক্ষমতাপ্রিয়। কংগ্রেস তাঁর সময় ভেঙেছে নীতি ও কর্তৃত্ব নিয়ে— (কল্যাণ রায়— ইন্দিরা গান্ধী, পৃ. ২০৫)। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে তিনি চেয়েছিলেন একাধিপত্য। কংগ্রেসে একক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তিনি নতুন দল গঠন করেছেন। তাতে তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা।

তাঁর সময় তিনি পছন্দমতোই ভি ভি গিরি, ফক্রুদ্দিন আলী আহমেদ, জৈল সিং প্রমুখ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি করেছেন। এইচ. এম. পণ্ডিত লিখেছেন, এভাবেই 'The Prime Minister's President' কথাগুলো এসেছে— (দ্য প্রাইম মিনিস্টার'স্ প্রেসিডেন্ট, পৃ. ১০১)।

ক্যাবিনেটেও তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা। তিনি মোরারজী দেশাই, দীনেশ সিং, হনুমন্তিয়া প্রমুখ মন্ত্রীদের সরিয়েছেন বিভিন্ন পদ্ধতিতে। তাঁর সময়ে তাঁর মন্ত্রীরা ছিলেন তাঁর ছায়ামাত্র— তাঁদের আদৌ স্বাধীন সত্তা ছিল না। ডঃ এল এম সিংভী মন্তব্য করেছেন, তাঁর মন্ত্রীরা ছিলেন 'delegates of the Prime Minister'— (দ্য স্টেটস্, ১.৯.৭৩)। তাঁর সময় যেমন সঞ্জীব রেড্ডী ছাড়া সব রাষ্ট্রপতিই ছিলেন তাঁর লোক('All the Presidents who worked with Mrs. Gandhi's excepting Sanjiva Reddy, were Prime Minister's Presidents'— এস এল সিক্রি— ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ১৩০), তেমনি মন্ত্রীরা ছিলেন তাঁরই আজ্ঞাবহ ব্যক্তি। লোকসভায় কংগ্রেসের বিপুল গরিষ্ঠতা থাকায় (১৯৬৭ ছাড়া) সেখানেও তিনি প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পেয়েছেন। এমন কি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেটাও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন— (ড. এ সি কাপুর— দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ৩৭৪)। এক কথায় বলা যায়— তাঁর আমলে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে। এইচ এম জৈন মন্তব্য করেছেন— যা ছিল 'one party-dominant system,' সেটা হয়ে গেছে 'one person-domінent system' (দ্য স্টেটস্ম্যান, ৩০.৫.৮২)।

পরবর্তীকালে অবশ্য নরসীমা রাও, ইন্দ্রকুমার গুজরাল প্রমুখ প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি করতে পারেননি— দলীয় প্রাধান্য ছিল না, তাছাড়া ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ের।

মনমোহন সিংয়ের ব্যাপারেও একই কথা বলা চলে। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এখন ফিরে এসেছে অন্যভাবে। প্রধানমন্ত্রী নন— এখন কেন্দ্রে আছেন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী। বলা চলে— ভারতীয় রাজতন্ত্রে তিনিই হলেন মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী। সরকারি কোনও পদে না থাকলেও সরকারের যে কোনও বিজ্ঞাপনে তাই তাঁর সাহাস্য ফটো দেখা যায়।

অনুগত মনমোহন সিংকে তিনিই প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়েছেন। বিভিন্ন মন্ত্রীরাও তাঁর অনুগত— তাঁর কথারই তাঁরা প্রতিধ্বনি করেন, তাঁর ছেলেকে তাঁরা বারবার ক্ষমতার উচ্চ আসনে বসাতে চান তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

এবারের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও সেই ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রণব মুখার্জী বুঝেছেন কিনা জানি না— তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করে সোনিয়া গান্ধী তাঁকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিয়েছেন যাতে মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় স্থান থেকে তিনি আর ওপরে না উঠতে পারেন— ভবিষ্যতে সেই স্থানটা রইল রাহুল গান্ধীর জন্য। উপরাষ্ট্রপতি পদটাও উপেক্ষা করার মতো নয়— হঠাৎ তাঁকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ চালাতে হয়। এখন সেটাও তাঁর নিজের কুক্ষিগত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তো বিশ্বাসভাজন ও অনুগত ব্যক্তি। এভাবেই তিনি ক্ষমতাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছেন।

সেইজন্যই বলা যায়— ব্যক্তি পুজো কংগ্রেসের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবারতন্ত্র। তার ফলে যেমন দলের ভিতর গণতান্ত্রিক নীতি বিনষ্ট হয়েছে, তেমনি বিনষ্ট হয়েছে তার ভাবমূর্তি। আশ্চর্যের বিষয়— দলের প্রবীণ ব্যক্তিরা এটা না বুঝেই সম্রাজ্ঞীকে সেলাম ঠুকে চলেছেন।

দুর্নীতি ও কেন্দ্রীয় সরকার

অমলেশ মিশ্র

কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতি নিয়ে দেশের সংসদ উত্তাল। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর পদত্যাগ দাবী করেছে। পরপর কয়েকদিন সংসদ অচল করে দিয়েছে বিজেপি। প্রণব মুখোপাধ্যায় চলে গেছেন রাষ্ট্রপতি হয়ে। তাই কংগ্রেস তথা সরকার পক্ষ সামলাচ্ছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। এতদিনকার গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য ভ্যানিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে তাঁকে এখন সংসদে নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে মুলায়ম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ যাদব প্রমুখ ধুরন্ধর দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে সলাহ্-পরামর্শ করতে হচ্ছে। কীভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার চালাতে হয়, কীভাবে দুর্নীতি করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে ওঁরা অভিজ্ঞ। আর দুর্নীতি থেকে কংগ্রেস এবং তার পরিচালিত সরকারকে রক্ষা ও প্রশ্রয় দেওয়া তাঁদের প্রাণের দায়ও বটে। অভিজ্ঞ সাংসদ সোনিয়া গান্ধী যথার্থ দরজাতেই খট্‌খটিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে এরা সান্ত্বনা এবং সুরক্ষা দেবেন স্বাভাবিকভাবেই। এটা ওদের গুরুদক্ষিণাও বটে।

কেন্দ্রে সরকারে আসার পর থেকেই, সেই প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর আমল থেকেই কংগ্রেসের দুর্নীতির হাতেখড়ি, প্রাথমিক, মাধ্যমিকে প্রতিবার ভাল ফল, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও সর্বোচ্চ স্থান দখল, কংগ্রেস ও তার সরকারের ৬০ বছর বা তার বেশিকালের ঘরানা। তাকে সেখান থেকে হটানো সহজ নয়। প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা তা জানেন, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে যে রাজনৈতিক দলগুলি গঠিত হয়েছে এবং সেগুলির নক্ষত্ররাও তা জানেন। সংসদে প্রধান দলগুলির মধ্যে একমাত্র বিজেপি নামে দলটি কংগ্রেস থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা কোনও দল নয়। যে জৈব রাসায়নিক ক্রিয়াতে গান্ধারীর শতপুত্র হয়েছিল, একই প্রক্রিয়ায় কংগ্রেস থেকে এতগুলি দলের জন্ম হয়েছে। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র বিজেপি। মার্কসবাদী নামে পরিচিত কয়েকটি দল যদিও কংগ্রেস ঘরানা-জাত নয় এবং কৌশলপ্রধান হওয়ায় তারা কখন যে কংগ্রেসের পক্ষে আর কখন যে বিপক্ষে থাকবেন তা তাদের কৌশলগত বিষয়। একটি বিষয়েই কেবল তাদের অবস্থান সর্বদাই স্পষ্ট যে কেন্দ্রে কংগ্রেস বিরোধী শক্তি হিসাবে কখনও বিজেপি-কে সমর্থন করা হবে না। কংগ্রেস সরকারকে উৎখাত করার ক্ষমতা যার আছে সেই বিজেপি-কে সমর্থন করা নয়— কংগ্রেসকে কেন্দ্রে রাখতেই হবে। দুর্নীতির মতো প্রশ্নে গলাবাজী ওঁরা নিশ্চয় করবেন কিন্তু সরকার পতনে অংশগ্রহণ করবেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদের ভিতরে ও বাইরে গলাবাজী দুর্নীতি বিরোধিতার থেকেও মূল্যবান। যশ এবং অন্যান্য সুবিধা এনে দেয়।

২০০৯ সালে কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে সরকারটি গঠিত হয়েছে--- সেই সরকারটির বিরুদ্ধে বেশ বড় বড় কয়েকটি দুর্নীতির অভিযোগ এই তিন বছরে উঠেছে। এবং সেগুলি কেবলমাত্র বিরোধীদের কথার কথা নয়। কমনওয়েলথ্ গেমস্-এর দুর্নীতি নিয়ে যখন ঝড় উঠেছে— তাকে ম্লান করে দিয়ে টু-জি স্পেকট্রাম দুর্নীতি বেরিয়ে পড়ল। ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। এত বড় ঘোটালার খবর তার আগে ছিল না। টু-জি স্পেকট্রাম ঘোটালাকেও ম্লান করে দিয়ে এখন এসেছে কয়লা বন্টন ঘোটালা।

কমনওয়েলথ্ গেমস্ দুর্নীতিতে পরোক্ষভাবে প্রধানমন্ত্রীর কথা উঠেছিল। টু-জি স্পেকট্রামে আর একটু গভীর ভাবে এবং বর্তমান কয়লা ঘোটালায় অনেক বেশি করে প্রধানমন্ত্রী জড়িয়ে গেছেন।

সংসদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঝড়টা তুলেছে বিজেপি। সংসদের বাইরে রাজপথের উপর দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন— আন্না হাজারে এবং স্বামী রামদেব। ২০০৯ সালেই লোকসভা নির্বাচনের আগে কালো টাকার প্রসঙ্গটি বিজেপি এনেছিল তার নির্বাচনী ইস্তাহারে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সরকার গঠন করতে পারলে—বিদেশী ব্যাঙ্ক থেকে কালো টাকা উদ্ধার করবে। দুনিয়ার মজদুর এক হও-এর মত রাজনৈতিক স্লোগান, দুনিয়ার ইসলাম এক হও-এর মত সাম্প্রদায়িক স্লোগান যেমন শোনা যায় তেমন শোনা গেল দুনিয়ার দুর্নীতিবাজ এক হও। এক হয়েও গেল কংগ্রেসী পতাকার নীচে। বিজেপির স্লোগান কাজে এল না। গঠিত হলো কংগ্রেসের নেতৃত্বে দুর্নীতিবাজদের সরকার। অনেকেই হাত পাকিয়েছেন,

> আমাদের ভুল হচ্ছে যে আমরা আমড়া গাছ থেকে আম চাইছি। আঁটিটা যদি আমড়ার হয়, কলমের গাছ হলেও আমড়াই পাওয়া যাবে— সেটা হয়তো সুস্বাদু হবে কিন্তু আম হবে না। লোভী এবং স্বার্থপর মানুষেরা যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই চুরি করে। যেখানে আপাতত ভাবে সুযোগ নেই সেখানে সুযোগ তৈরি করে নেয়।

কেউ কেউ নূতন সরকারের মাধ্যমে হাত পাকাচ্ছেন। কংগ্রেস-কে সমর্থন করা ব্যতীত তাদের উপায়ন্তর কিছু নেই। এই ভাবে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার এই ৬০-৬৫ বছর পরেও ভারত সরকার কংগ্রেসের নেতৃত্বে বেশি বেশি করে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এবং সেই সরকারের সমর্থকও নেহাত কম নয়। দুর্নীতিকে সমর্থন করা ব্যতীত তাদেরও রাজনীতিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

তাঁরা বলছেন— দেশের লোক গুরুতর সমস্যায় জেরবার, সংসদে বিজেপি তা আলোচনা করতে দিচ্ছে না, সংসদ অচল করে রাখছেন, সংসদ সদস্য হিসাবে সংসদের অধিবেশনে যোগ দেওয়া তাদের অধিকার ইত্যাদি। 'দেশের লোক গুরুতর সমস্যায় জেরবার' —কথাটি একশ' ভাগ সত্য। কিন্তু দেশের লোকদের এই গুরুতর সমস্যায় কে বা কারা ফেলেছে? খেয়াল করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে 'দেশের লোক' বলতে আমরা জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-শ্রেণী নির্বিশেষে যাঁদের কথা বলি— যাঁরা মোট জনসংখ্যার ৯০ ভাগ, আজ পর্যন্ত তাঁরা কোনও সমস্যা তৈরি করেননি। দেশের যাবতীয় সমস্যা তৈরি করেছেন— রাজনীতি করা, বিশেষ করে যাঁরা সরকার চালান। যাঁরাই দেশের লোক-এর সমস্যা সৃষ্টি করেছেন তাঁরাই বলছেন— দেশের লোকের সমস্যা সমাধানের জন্য সংসদ চলতে দিতে হবে। এর থেকে হাস্যকর এবং অধিকতর প্রতারণার কিছু আছে?

দুর্নীতি সংক্রান্ত তাবৎ ঘটনাই সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সাধারণ মানুষের অর্থ নেতারা মন্ত্রীরা চুরি করেছেন— সমস্যা তৈরি হচ্ছে। যারা সমস্যা তৈরি করলেন মন্ত্রী হয়ে, তাঁরাই সাংসদ হয়ে সমস্যা সমাধানের কথা বলছেন। এটা তো স্রেফ ঠকানো-প্রতারণা।

যে সমস্ত মন্ত্রী কেন্দ্রে অথবা রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গসহ) দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের পিছনের কথা অনুসন্ধান করুন। দেখবেন তাদের পাঠক্রমে— দেশ ভক্তির শিক্ষা ছিল না, পরার্থপরতার শিক্ষা ছিল না, মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা ছিল না। তাঁদের পাঠক্রমে ছিল—প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা, লোভ এবং এই কারণে আক্রমণাত্মক স্বভাব। শুধু পাঠক্রম নয়— তাঁদের পারিবারিক সংস্কারের কথাও বিবেচনায় আনতে হবে।

আমাদের ভুল হচ্ছে যে আমরা আমড়া গাছ থেকে আম চাইছি। আঁটিটা যদি আমড়ার হয়, কলমের গাছ হলেও আমড়াই পাওয়া যাবে— সেটা হয়তো সুস্বাদু হবে কিন্তু আম হবে না। লোভী এবং স্বার্থপর মানুষেরা যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই চুরি করে। যেখানে আপাততভাবে সুযোগ নেই সেখানে সুযোগ তৈরি করে নেয়।

একবার এক রাজা তার এক রাজকর্মচারীর উৎকোচ নেওয়ায় খবর পেলেন। উৎকোচপ্রেমী কর্মচারীকে রাজা কর্মচ্যুত করলেন না, পাঠিয়ে দিলেন নদীর ধারে। বললেন— যে আট ঘণ্টা সময় সে কাজ করবে— সেই সময়কালে নদীতে কয়টা ঢেউ হয়েছিল গুণে নিয়ে ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারীর কাছে প্রত্যহ রিপোর্ট দিতে হবে। রাজা ভাবলেন— উচিত শাস্তি দেওয়া গেছে। এখন আর উৎকোচ নেওয়ার সুযোগ নাই। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্যরকম। ওই উৎকোচপ্রেমী রাজকর্মচারী— নদীর একপ্রান্তে একটি গাছে একটি মোটা দড়ি বাঁধলেন এবং অপরপ্রান্তটি নিজের হাতে রাখলেন। যখনই কোনও নৌকা ডিঙ্গি, বজরা ইত্যাদি আসে— কর্মচারী চেঁচিয়ে উঠেন— 'আরে কর কি, কর কি রাজার ঢেউ ভেঙ্গে দিলে যে— চল চল রাজার কাছে চল বিচার হবে।' রাজার কাছে বিচারে যাওয়ার থেকে দু-দশ টাকা ধরিয়ে দিলেই ঢেউ ভাঙ্গার অপরাধ থেকে রেহাই।এই ধরনের ব্যক্তিরা যখন শাসক হন তখন তাদের কার্যাবলীতেই দেশের লোক-এর গুরুতর সব সমস্যা তৈরি হয়। যারা এই সব দুর্নীতিতে যুক্ত তারা কোনওকালেই সাজা পায় না। তাকে সমর্থন করার মতো দুর্নীতিবাজেরও অভাব নাই।

সোনিয়া গান্ধী অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি ব্ল্যাকমেল করছে। বিজেপি কেন কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্ল্যাকমেল করবে বোঝা যায় না। প্রকৃতপক্ষে— কংগ্রেস, এন সি পি (শরদ পাওয়ার), এস পি (মুলায়াম সিং যাদব), আর জে ডি (লালুপ্রসাদ), বি এস পি (মায়াবতী), টি এম সি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)— এরাই কংগ্রেসকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে, করে এবং কংগ্রেসও ওদের ব্ল্যাকমেল করতে পারে, করেও। কংগ্রেস-কে ব্ল্যাকমেল করে ওদের কিছু পাওয়ার আছে, আবার কংগ্রেসও ওদের ব্ল্যাকমেল করে কিছু পেতে পারে। হিসাব করলে দেখা যাবে কেন্দ্রে কংগ্রেস যাদের সমর্থনে এই সংখ্যালঘু সরকার চালাচ্ছে— তাদের সমর্থন ওই ব্ল্যাকমেলের ভিত্তিতেই। ওদের সাধারণ পাঠক্রম এবং রাজনৈতিক পাঠক্রমে যে স্বার্থপরতা, লোভ ও স্বার্থসিদ্ধির শিক্ষা দেওয়া হয় তার রূপায়ণ অনেকটাই ব্ল্যাকমেল নির্ভর। আমরা তো প্রমাণও পাচ্ছি। বিজেপির কংগ্রেসের কাছ থেকে পাওয়ার কিছুই নাই বরং কংগ্রেসের বিরুদ্ধতা করে বিকল্প সরকার গঠনের কথাই তো ওদের মুখে শোনা যায়। বিজেপি কংগ্রেসকে ব্ল্যাকমেল করছে— এটা একটি অরাজনৈতিক বালখিল্য মন্তব্য। প্রণব মুখোপাধ্যায় এই সময় কংগ্রেসের সরকারি বেঞ্চে থাকলে এমন্তব্য করতেন না। কারণ এর পিছনে যুক্তি পাওয়া যাবে না।

আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত এই সরকার অপরকে দোষ দিয়ে নিজে কি কলঙ্ক মুক্ত হতে পারবেন? দেশ এবং দেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে যে মানসিকতা তৈরি হয়, দেশ চালানোর জন্য সেই মানসিকতাই প্রয়োজন। মনমোহন থেকে মমতা, কংগ্রেস এবং তার সমর্থনকারী দলগুলি সেই শিক্ষা পায়নি যা দেশ ও দেশের মানুষ সম্পর্কে গভীর ভালবাসা তৈরি করে। এরা ঢেউ গুণতে গিয়েও কামাতে পারেন। এরা ভাল কেরাণী বা রাজকর্মচারী হিসাবে বে-মানান নন। কিন্তু দেশ পরিচালক হিসাবে অযোগ্য। তাই ৬০-৬৫ বছরে কেবল ওই দুর্নীতির ধুনই শোনা যায়, বেকারী, অস্বাস্থ্য, অ-শিক্ষা দূর হয় না। শুধু কালো টাকা উদ্ধার করতে পারলেই ভারতবর্ষ আক্ষরিক অর্থেই সোনার রাস্তা বানাতে পারত। উল্টে আরও দুর্নীতি, আরও কালো টাকা, আরও ভাঙ্গা রাস্তা, আরও বন্যা, আরও খরা, আরও বেকার, আরও জঙ্গি আক্রমণ, আরও অ-শিক্ষা এবং শিক্ষার নামে কু-শিক্ষা। নূতন পাঠক্রম চাই। যে পাঠক্রম দেশকে ভালবাসতে, দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখাবে, সংসদ, মন্ত্রিসভা ও বিধানসভাগুলি দেশপ্রেমিকদের দখলে থাকবে। ▯

কংগ্রেসের দেশ-সেবা মানে ‘মাল কামানো’

দেবব্রত চৌধুরী

দেশ স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেস পার্টির সবথেকে বড় খাদ্যই হলো যে কোনও সরকারি ডিলের থেকে ‘কিক্‌ব্যাক’ আর ‘কাটমানি’। কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্য।

দেশের প্রথম সরকার কংগ্রেস পার্টি গদিতে বসেই যে ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে সরকারি টাকা হাতিয়েছেন, তার ইতিহাস দেখে বলতে হয় এ সরকারকে একদিনও গদিতে রাখা উচিত নয়।

নেহরুঃ যুগ থেকে আজ মনমোহন-সোনিয়া যুগ পর্যন্ত যেভাবে দেশের গরীব মানুষের অর্থ কংগ্রেস লুঠ করে দেশকে দেউলিয়া করে দিয়েছে তা আজ ইতিহাসের গবেষণার বিষয়।

কংগ্রেস দেশের টাকা ‘হাতসাফাইয়ের’ খেলা শুরু করে ১৯৪৮ থেকেই মানে দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক মাস পর থেকেই। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজনে ১৯৪৮ সালে নেহরু ইল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে ৪০০০ জীপ কেনার জন্য জীপের মোট দামের ৬৫ শতাংশ দাম অগ্রিম দিয়ে দেয় নেহরু বন্ধু মিঃ ভি কে মেনন মারফৎ। ১৯৪৯-এ কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতির সময় পর্যন্ত মাত্র ১৫৫টি জীপ ভারতে আসে যা মোট বরাদ্দের ৪ শতাংশও নয়। আর পাঠানো জীপগুলি ছিল দ্বিতীয় যুদ্ধে অকেজো জীপ। পার্লামেন্ট নিযুক্ত অনন্তস্বামীনন কমিটি দেশের টাকা নয়ছয় করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে মেননকে দায়ী করলেও ১৯৫৫ সালে নেহরু বললেন ‘জীপ কেলেঙ্কারী’ এখন ক্লোসড চ্যাপ্টার। নেহরু তার বন্ধু শ্রী ভি কে মেননকে তার সরকারে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করে ছিলেন পরবর্তীকালে।

পরের দুর্নীতি হরিদাস মুন্দ্রা কেলেঙ্কারি। মুন্দ্রাকে বেআইনী ভাবে এল আই সি থেকে টাকা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুললো নেহরুর জামাই তথা ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধী। অভিযোগ সত্য বলে রিপোর্ট দিলেন এন সি চাগলা কমিশন। কিন্তু হরিদাস মুন্দ্রা কংগ্রেস পার্টিকে মোটা অঙ্কের ‘মাল’ দিয়ে খালাস পেয়ে গেলেন।

১৯৬৩ সালের খনিমন্ত্রী মালবিয়া ও সিরাজুদ্দিন মামলায় এস এন দ্বিবেদী প্রমাণ করলেন মালবিয়া স্ত্রীর জন্য ৫৫০০০ টাকার গহনা এবং পরিবারকে একটি গাড়ী উপহার দিয়ে কোটি কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা অপব্যবহার করেছেন। সিরাজুদ্দিন সাহেব ও নেহরুর কংগ্রেসকে ‘কোটি টাকার মাল’ দিয়ে রেহাই পেয়ে যান। (সূত্র : Corruption by Mr. S.S. Gill P-52)

মধ্যপ্রদেশের রবিশঙ্কর শুক্লা জীবন শুরু করেছিলেন এক সাধারণ স্কুল মাস্টার হিসাবে। কিন্তু নেহরুর সান্নিধ্যে আসার দৌলতে কয়েকশো কোটি টাকা বাগিয়েছিলেন যা তার তিন পুরুষ খেয়ে শেষ করতে পারবে না। আর এক নেহরু বশংবদ ছিলেন নেহরুর ‘চামচা’ কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ, শুরু করেছিলেন একজন দৈনিক ২০ টাকা মুজুরীর দর্জি হিসাবে। নেহরুকে ‘মাল’ উপঢৌকন দিয়ে নিজে কামিয়েছিলেন কয়েকশো কোটি টাকা। একই কাহিনী পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কাইরোর। নেহরুকে ‘খুশী’ করে ক্রোড়পতি হয়েছিলেন। এস আর দাশ কমিশন এই তথ্য পেশ করা সত্ত্বেও ও নেহরু এদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি। লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়েই প্রতাপ সিং কাইরোকে অন্তত পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন।

এর পর এলো ইন্দিরা যুগ যার নাম ‘লাইসেন্স কোটা-পারমিট রাজ’। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বংশীলাল বিমানবাহিনীর আপত্তি সত্ত্বেও ইন্দিরা-কে ‘খুশী’ রাখার জন্য প্রতিরক্ষা বিভাগের ‘অস্ত্র’ জমা রাখার ৪৪৫ একর জমি মারুতি-কে দিয়ে দিলেন। এ কাজের টাকা তোলার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করেছেন তৎকালীন আর কে ধাওয়ান, ওম মেহেতা (গৃহমন্ত্রী), প্রণব মুখার্জী (অর্থমন্ত্রী), এ পি শর্মা (শিল্পমন্ত্রী), তার বংশবদ এল এন মিশ্র এবং যশপাল কাপুর। ‘কোটা’ রাজের আড়ালে কোটি টাকা পৌঁছে দিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধীকে (সূত্র : Pathology of Corruption-Mr. S.S. Gill)

১৯৭১ সালের মে মাসে ইন্দিরা গান্ধীর ফোনের নির্দেশে এক আর্মি ক্যাপ্টেন শ্রী নাগরওয়ালাকে এস বি আই দিল্লী ৬০ লক্ষ টাকা দেন। ইন্দিরাজী তার কোড নাম নিতেন— ‘বাংলাদেশবাবু’। নাগরওয়ালা একথা ফাঁস করে দেওয়ায় প্রথম পুরে দেওয়া হয় জেলে। তারপর ছেড়ে দিয়ে গাড়ী চাপা দিয়ে মেরে ফেলে এই ‘মাল’ কামানোর কাহিনী সাফ করা হয়। ইন্দিরা গান্ধী তার কেবিনেটের সব মন্ত্রীকে টাকা তোলার কোটা করে দিয়েছিলেন। এই কোটা কামানোর জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী ‘মাল’ পৌঁছে দিয়েছেন।

নিজেদের পরিবারের জন্য বিপুল অর্থ কামিয়ে নিয়েছেন। তারপর এলো রাজীব যুগ। এই যুগকে বলা যায় 'অন্ধ নগরী চৌপট রাজা'। এ আর আন্তলে, গুণ্ডা রাও এবং বংশীলাল— এরা যে-ভাবে পেরেছে 'মাল' পৌঁছে দায়িত্ব পালন করে নিজেদের আখেরে গুছিয়ে নিয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে বোফোর্স মামলা আর শ্বশুরবাড়ীর লোক অটোভিয়া কাত্রেচ্চী কীর্তি।

নরসীমার আমলে হর্য মেহতার কেস, বুটা সিং-এর জে এম এম ঘুষ মামলা। এ যুগকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কাগজে--- 'Corruption in India has tranceaded the status of a local Specific Cottage Industry to becames heavy Industry with ancilleries all over Country.'

বর্তমান মনমোহন-সোনিয়া যুগে দুর্নীতিকে জাতীয়করণ করা হতে চলেছে। এই সরকারের জামানা দুর্নীতি ও কর্পোরেট লুটের এক জঘন্য নজির হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২জি কেলেঙ্কারী থেকে কয়লা কেলেঙ্কারী— দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থলোলুপ কর্পোরেটগুলোকে দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার মূল্যবান সম্পদকে লুট করতে সায় দিচ্ছে। এটা কি ভালবেসে? না 'মাল' দেওয়ার সুবাদে। বর্তমান সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের উপর নেমে এসেছে এই সার্বিক হামলা, খাদ্যপণ্য সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বারবার জ্বালানির দাম বাড়ানো হচ্ছে। কেন্দ্রের সরকার ঘোষণা করছে যে গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে যারা দৈনিক যথাক্রমে ২৩ ও ২৮ টাকার বেশি খরচ করতে পারেন তারা নাকি গরিব নন। 'খাদ্য নিরাপত্তা' সংক্রান্ত সরকারি কথাবার্তা পুরাপুরি তামাশায় পরিণত হয়েছে। সরকারি গুদামগুলিতে খাদ্যপণ্য নষ্ট হয়ে গেলেও ৩৩ কোটি ভারতবাসী অনাহারে দিন কাটায়। কেন্দ্রিয় ও রাজ্যসরকার ঋণগ্রস্ত কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনাগুলোকে ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে সমস্ত ক্ষেত্র— শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ-পানীয় জল বেসরকারিকরণের পথে চলছে সরকার। দেশজুড়ে দলিতদের ও মহিলাদের উপর অত্যাচার আদিম যুগকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে নারী ধর্ষণ ঘটনাকে সাজানো গল্প বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

সরকারি লুট, কর্পোরেট লুট, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক বর্তমান 'মাল কামানোর' সরকার। নিজেদের অধীন সংস্থা ক্যাগ এবং সিবিআই- এর রিপোর্ট মানতে বাধ্য নন বলে হুঙ্কার দিচ্ছেন। এ গণতন্ত্রের অপমান। একদিন জনাদেশের উপর শ্রদ্ধা রেখে কংগ্রেসের এক প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন, সেটা বোধহয় ভুলে গেছেন মনমোহন সিং। ▯

স্বস্তিকা-র বিশেষ বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

স্বস্তিকা একটি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী নির্ভীক সংবাদ সাপ্তাহিক। গত ৯ আগষ্ট, ২০১২, শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৫ বছরে পদার্পণ করেছে। এই উপলক্ষে এবং স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে স্বস্তিকা-র বিশেষ নতুন বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযানের সময়কাল ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

সকল পাঠক-বন্ধুদের প্রতি বিনম্র নিবেদন এই যে, আপনি নিজে এই পত্রিকার গ্রাহক হোন ও অন্যদের গ্রাহক হতে অনুপ্রাণিত করুন। স্বস্তিকা-র বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা মাত্র। অভিযান চলাকালীন এবং সর্বশেষ ৭ই অক্টোবর, ২০১২-র মধ্যে গ্রাহকের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহকমূল্য স্বস্তিকা দপ্তরে জমা করে রসিদ সংগ্রহ করুন। এর ফলে এবছরের স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা পেতে সুবিধা হবে। চেক বা ড্রাফট্ Swastika -এই নামে লিখে স্বস্তিকার ঠিকানায় পাঠাবেন। এছাড়া স্বস্তিকা-র নামে মানিঅর্ডার যোগেও টাকা পাঠাতে পারেন। ঠিকানা— ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬।

আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই পত্রিকা ৬৫ বছর অতিক্রম করেছে। ভবিষ্যতের জন্যও আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

কয়লা দুর্নীতি : কেন মনমোহনের সরে যাওয়া উচিত

তারক সাহা

প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের একটা স্বচ্ছ, সৎ ছবি ছিল দেশবাসীর মনে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সেই ছবি মলিন থেকে মলিনতর হচ্ছে। বলা হয়, মনমোহনের দুই কীর্তি— দুর্নীতি আর মূল্যবৃদ্ধি। মনমোহনের দ্বিতীয় ইউ পি এ পর্ব কেবল কেচ্ছা আর কেলেঙ্কারিতে ভরা। আদর্শ আবাসন, স্পেকট্রাম ২-জি বন্টন, কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারির পর মনমোহনের মুকুটে দুর্নীতির আরেকটা পালকের সংযোজন 'কয়লা কেলেঙ্কারি'। ২০১৪ সাল অবধি এই সরকার টিকে থাকলে দুর্নীতির সাপ ফুঁড়ে আমাদের সৎ, গোবেচারা প্রধানমন্ত্রীকে আর কতবার যে দংশন করবে কে জানে!

কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল একটি স্বতন্ত্র, সাংবিধানিক সংস্থা, সরকারি সংস্থাগুলির হিসেব-নিকেশ করে। আর সেই সংস্থার ১৭ আগস্ট, ২০১১-তে যে রিপোর্ট সংসদে পেশ হয় তা নিয়ে সারা দেশ উত্তাল। দুর্নীতির এই নবতম সংযোজন কীভাবে সরকারকে বিব্রত করছে তার একটা রেখাচিত্র নীচে দেওয়া হলো।

১৬ জুলাই, ২০০৪— কয়লা সচিব পি. সি. পারেখ তদানীন্তন খনি ও কয়লার রাষ্ট্রমন্ত্রী দশরি নারায়ণ রাওকে চিঠি লিখে প্রতিযোগিতামূলক নিলামের সুপারিশ করেন।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০৪— প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক বিবৃতি জারি করে প্রতিযোগিতামূলক নিলামে ত্রুটির কথা উল্লেখ করে। এতে ব্লক বন্টনে দেরির কথা বলা হয়।

১ নভেম্বর ২০০৪--- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা পি এম ও কয়লাখনি (জাতীয়করণ), ১৯৭৩ সালের বিলটির

সংশোধনে বাধাদান করে। আর এতেই বলা হয়েছিল প্রতিযোগিতামূলক নিলামে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর কথা।

২৫ জুলাই ২০০৫—যেহেতু কয়লাখনি অ্যাক্ট-এ সংশোধনীর বিলম্বের কথা তুলে পি এম ও স্থির সিদ্ধান্ত নেয় কয়লা ব্লক বন্টনের ব্যবস্থা করবে স্ক্রিনিং কমিটি।

৭ এপ্রিল ২০০৬—পি এম ও স্থির করে সমস্ত খনিজের নিলামের ব্যবস্থা করবে। কয়লামন্ত্রক খনিজ মন্ত্রককে বলে এই নিলামের বাস্তবতা সম্পর্কে আইনমন্ত্রকের পরামর্শ নিতে।

২৮ জুলাই ২০০৬--- আইনমন্ত্রক সরকারকে জানায় নিলামের পন্থা কী, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে হবে নাকি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে?

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬— কয়লামন্ত্রক পি এম ও-কে জানায় যে, আইনমন্ত্রকের পরামর্শক্রমে এম এম ডি আর আইন সংশোধনের মাধ্যমেই প্রতিযোগিতামূলক নিলাম হোক।

১৭ অক্টোবর, ২০০৮--- বিলের সংশোধনীর মাধ্যমে (এম এম ডি আর অ্যাক্ট, ১৯৫৭) সংসদে পেশ হয়।

৩১ অক্টোবর ২০০৮— বিলটি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠানো হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯--- স্ট্যান্ডিং কমিটির অনুমোদন পায় বিলটি।

সেপ্টেম্বর ২০০৯— ততক্ষণে ১৪২টি ব্লক বন্টিত হয়ে গেছে, ৫৭টি আবার প্রাইভেট অপারেটরদের মধ্যে।

আগস্ট ২০১০— সংসদে বিলটি পাশ হয়।

ফেব্রুয়ারি ২, ২০১২— এম এম ডি আর অ্যাক্টের নোটিশ জারি হয় (সংশোধনী)। এরপর প্রাইভেট অপারেটরাও নিলামের মাধ্যমে যাবে। কিন্তু ব্যাপার হলো আগেভাগে আদেশ জারির মাধ্যমে নিলাম করা গেলেও পি এম ও সেই পথে হাঁটেনি।

ওপরের দিনপঞ্জীর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, কয়লা বন্টনের বিষয়টি সরাসরি পি এম ও অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং ওই দপ্তরের শীর্ষে রয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং সরকারের শীর্ষব্যক্তি কীভাবে এর দায় এড়াতে পারেন? দ্বিতীয় কথা হলো আইন প্রণয়ণে বিলম্ব ঘটলে সরকার তা আদেশ জারি করে নিলামের মাধ্যমে কয়লা বন্টনের ব্যবস্থা করতেই পারত। কিন্তু সেই পথে হাঁটেনি সরকার। এমনিতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে সংঘটিত কেলেঙ্কারির দায় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সরকারের শীর্ষ ব্যক্তির ওপর বর্তায়। সেক্ষেত্রে উচ্চ নৈতিকতার দায়ে শীর্ষ ব্যক্তির সরে যাওয়া উচিত হলেও আমাদের দেশে এমনটা হয় না। কিন্তু কয়লা কেলেঙ্কারিতে পি এম ও সরাসরি জড়িত, সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি এর সঙ্গে যুক্ত। তাই প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবির মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই। ▯

চিঠিপত্র

অঙ্কুরেই বিনাশ

দার্জিলিং পাহাড়ে বোধহয় শান্তির বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসবে কিনা ভবিষ্যতই বলবে।

সালটা সম্ভবত ১৯৮২ কী ১৯৮৩ হবে, আজ আর সঠিক মনে করতে পারছি না। ডাক-বিভাগের কর্মী সম্মেলনে যোগ দিতে গ্যাংটক গিয়েছিলাম। ফেরার পথে দার্জিলিং হয়ে ফিরছিলাম। দার্জিলিং শহর থেকে বেড়িয়ে কিছুদূর আসার পর দেখলাম পাহাড়ের গায়ে লাল কালিতে লেখা— 'Bengali Administration Quit Darjeeling.' কে বা কারা লিখেছে তার উল্লেখ নেই। তখন সুভাষ ঘিসিং-এর নাম সমতল কেন পাহাড়ের অনেকেই শোনেননি। ওই লেখা দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম ভিতরে, ভিতরে, একটি সংগঠন তৈরি হচ্ছে। এর পিছনে কে বা কারা আছে আমাদের গোয়েন্দা দপ্তর কী সেটা বুঝতে বা জানতে পারেনি, বাসে বসে এটাই ভাবছিলাম।

পরবর্তীতে হঠাৎ সুভাষ ঘিসিং-এর নাম পত্র-পত্রিকায় বেশ ফলাও করে প্রচার এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বারবার ডেকে নিয়ে ঘিসিং- এর সাথে আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলেই ঘিসিং রাতারাতি বড় মাপের নেতা হলেন। অনেক আলাপ আলোচনার পর 'গোর্খা পার্বত্য উন্নয়ন পরিষদ' গঠন করে ঘিসিং-কে পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান করা হয়। উন্নয়নের স্বার্থে পার্বত্য পরিষদের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা আসতে লাগল। সুভাষ ঘিসিং-এর নেতা হওয়ার পিছনে রাজ্য ও কেন্দ্রের অবদান।

পাহাড়, ডুয়ার্স, তরাই অঞ্চলের উন্নতি সরকারি ভাবেই হওয়া উচিত। কোনও উগ্রপন্থী সংগঠনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া উচিত হয়নি। এক সময় ঘিসিং বলেছিলেন দার্জিলিং বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়া হোক। ঘিসিং-এর প্রধান দাবী ছিল স্বাধীন গোর্খাল্যান্ড যা অবাস্তব দাবী, বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী। ওই ধরনের বক্তব্যের জন্য কী রাজ্য কী কেন্দ্র কোনও আইনি ব্যবস্থা ঘিসিং-এর বিরুদ্ধে গ্রহণ করেননি।

বিশ্বের অন্য কোনও দেশে এ ধরনের মন্তব্য করলে, দেশবিরোধী বক্তব্যের জন্য দেশদ্রোহিতার অপরাধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করত। এটা ভারতবর্ষ। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক্ স্বাধীনতার নামে যে কেউ যা খুশি বলতে ও করতে পারে। রাষ্ট্র-এর বিরুদ্ধে কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না।

সরকারের উচিত ছিল প্রথমেই ওইসব আন্দোলনকারীদের সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিমল গুরং-রা জয়ী হয়েছে। কিছুদিন পরই বোঝা যাবে পাহাড়ের শান্তির হাওয়া কোন্‌দিকে প্রবাহিত হয়।

—অনিলচন্দ্র দেবশর্মা, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

হিন্দুত্বের লক্ষণ

সম্প্রতিকালে একটি জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী সংকীর্ণমনা কিছু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 'হিন্দু' শব্দটিকে বিকৃত করে এর অপব্যাখ্যা করতে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে। তাদের মতে হিন্দু শব্দটি সেকুলার ধর্ম বোঝায়। কিন্তু তারা বোধহয় ভুলে গেছে যে হিন্দু কথাটি কোনও বিশেষ ধর্ম বা জাতি বোঝায় নয়। হিন্দুত্ব বলতে ভারতীয়ত্ববোধ ও সব ধর্মের প্রতি ভালবাসা বোঝায়। এটা বেদান্তের একটি অমোঘ বাণী। হিন্দু কথাটির আসল অর্থ হলো সিন্ধুনদের তীরে ভারতের যে সমস্ত লোক বাস করত তারা সকলেই হিন্দু নামে পরিচিত। আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে এদের সকলকেই হিন্দু বলা হোত। বিদেশী জাতিগুলি সেই সময় 'সি' শব্দটি হি বলে উচ্চারণ করত। তাই তারা তৎকালীন সিন্ধু শব্দটিকে অপভ্রংশ করে হিন্দু বলে উচ্চারণ করত। আর তা থেকেই 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি। এর পরিচয় পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই। তাই হিন্দু কথাটি একটি প্রাচীন সনাতনী শব্দ যার অর্থ হলো মানব জীবনের রহস্য উদঘাটন পূর্বক জীবনের প্রকৃত রহস্য সন্ধানে অগ্রসর হওয়া। মনুষ্য জীবন যে শুধুমাত্র আত্মসুখ ও ভোগলিপ্সা চরিতার্থর জন্য নয়। এর প্রকৃত অর্থ মনুষ্যজীবনের সফল বাসনা-কামনা পরার্থে নিবেদন করে মানব কল্যাণে বিনা প্রত্যাশায় জীবনকে উৎসর্গ করা। এটা হলো প্রকৃত হিন্দুত্বের লক্ষণ। ভারতের মুনি ঋষিগণ যুগ যুগ ধরে গভীর তপস্যা করে এই সত্যেই উপনীত হয়েছিলেন এবং তাহাদের সেই উপলব্ধি আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য জাতিই কায়মনোবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। ও সেই পথেই তাঁরা সত্যানুসন্ধানে আজ অবধি প্রবৃত্ত আছেন। সুতরাং হিন্দুত্বকে কোনও মতেই এই সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা আদৌও উচিত হবে না।

—পাঁচুগোপাল ঘোষ, নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।

‘হাইকাস্ট’-রা এখন দেশের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক

সুহাস বসু

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, অরবিন্দ ঘোষ (ঋষি অরবিন্দ), তাঁর ভ্রাতা বারীন ঘোষ, হেমচন্দ্র ঘোষ, যতীন মুখার্জী (বাঘা যতীন), সূর্য সেন, কানাইলাল দত্ত, বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন দাস, বালগঙ্গাধর তিলক, বীর সাভারকার, ভগৎ সিং, সুখদেব ইত্যাদি যাঁরা ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য মরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন, কেউ কেউ ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন, তাঁদের উত্তরাধীকারীরা আজ এই স্বাধীন ভারতে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছেন। সরকারী খাতায় তাঁরা ‘হাইকাস্ট’ ফরওয়ার্ড কম্যুনিটি (High Cast forward Community)। এই সব বসু, ঘোষ, মুখার্জি, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জি, সেন, সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, দত্ত, তিলক, সিং, দেব ইত্যাদি পরিবারে এখন জন্মগ্রহণ করা এই স্বাধীন ভারতে অনেক পাপের ফল। ভাবছেন এ কী বলছি! হাঁ অতি সত্যি কথাই বলছি। কোনও সরকারী সাহায্য তো দূরের কথা, তাঁদের নামও কেহ মুখে আনে না। ধরে নেওয়া হয় তাঁদের কোনও সমস্যাই নেই। নেই বেকার সমস্যা, নেই লেখাপড়ার সমস্যা, নেই বাসস্থানের সমস্যা, নেই কোনও খাওয়া-পরার সমস্যা— তাঁরা সবাই জর্জ, ম্যাজিস্ট্রেট, টাটা, বিড়লা ধনকুবের রকফেলার। সর্বত্র তাঁদের সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ১০০-র মধ্যে ১০০ নম্বর পেলেও তাঁরা চাকুরি পাবেন কিনা সন্দেহ। কারণ তাঁরা ‘হাই কাস্ট’, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং- এর মতো উচ্চ শিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চস্থান পেলেও তাঁরা তা পড়তে পারবেন না কারণ তাঁরা ‘হাইকাস্ট’, তাঁরা যত গরীবই হোন না কেন পড়াশুনার জন্য তাঁদের ছেলে-মেয়েরা কোনও সরকারি সাহায্য বা স্টাইপেন্ড পাবে না— কারণ তাঁরা ‘হাই কাস্ট’ পরিবারে জন্মেছে, তাঁরা খেতে পান আর না-ই পান, তাঁদের জামাকাপড় জুটুক আর না-ই জুটুক, তাঁদের ঘর-বাড়ী থাকুক আর না থাকুক তা তৈরি বা মেরামতির জন্য তাঁরা কোনও সরকারি সাহায্য পাবেন না, কারণ তাঁরা যে ‘হাইকাস্ট’। চাকুরি জুটছে না তো ব্যবসা করার জন্য সরকার বা কোনও সরকারি ব্যাঙ্ক তাঁদের ধার বা লোন দেবে না, কারণ তার ‘হাইকাস্ট’, চাকুরীর দরখাস্ত দিতে গেলে কিংবা সাক্ষাৎকার (ইন্টারভিউ) দিতে গেলে তাঁদের ঘরের ছেলে-মেয়েদের পুরো ফীজ বা যাতায়াত খরচ বহন করতে হবে তা তাঁরা যত গরীবই হোক না কেন, কোনও ছাড় মিলবে না, কারণ তাঁরা ‘হাইকাস্ট’। তাঁদের বয়স সীমায়ও কোনও ছাড় মিলবে না, কারণ তাঁরা ‘হাইকাস্ট’। আরও আছে, সরকারি বিভাগীয় পরীক্ষায় (Departmental Examination) পাশ করতে গেলে ‘হাইকাস্ট’দের পেতে হবে ৬০ শতাংশ অথচ সিডিউল কাস্ট, ট্রাইব, ওবিসিদের ক্ষেত্রে তা মাত্র ৪০ শতাংশ। চাকুরীতে সামান্য ত্রুটি হলেই ‘হাইকাস্ট’দের ভাগ্যে জুটবে চরম হেনস্থা ও শাস্তি, অথচ সিডিউল কাস্ট, ট্রাইব, ওবিসি ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে তাদের সাতখুন মাপ। এ বিষয়ে প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যায়। আরও আছে যোগ্যতা সহযোগে কাজ করলেও ‘হাইকাস্ট’দের ক্ষেত্রে কোনও প্রমোশন হবে না, তাদের একই পদে বছরের পর বছর কাজ করতে হবে, অথচ সিডিউল কাস্ট, ট্রাইব, ওবিসিদের ক্ষেত্রে একেবারে চড় চড় করে প্রমোশন। এমনও দেখা গেছে যে হাইকাস্টের অধীনে তাঁরা জয়েন করেছেন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তাঁরা একেবারে সেই বসের মাথায় উঠে বসেছেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ঘোষ, বসু, মিত্র, চ্যাটার্জী, মুখার্জী ইত্যাদি পদাধীকারী তথাকথিত ‘হাইকাস্ট’রা জীবনের প্রতি পদে পদে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন, আর যত সরকারি সুযোগ-সুবিধা সরকারি দাক্ষিণ্য তা সব বর্ষিত হচ্ছে তথাকথিত এস-টি, এস-সি, ওবিসিদের উপর।

স্বাধীনতা সংগ্রামী তথাকথিত হাইকাস্টদের ঘরে জন্মগ্রহণ করাটাই এখন বড় অপরাধ। পরাধীন ভারতে বলা হোত যে ইংরেজরা এদেশে Divide and Rule নীতি প্রয়োগ করে তাদের শাসন কায়েম রাখতে চায়। কিন্তু ইংরেজরা তো শুধু হিন্দু-মুসলমান বিভেদ চালু করেছিল, অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস এই স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসকবর্গ তাঁদের শাসন কায়েম রাখার জন্য শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়, সমগ্র সমাজকে যে আরও কতভাগে ভাগ করে চলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর এই ভাগ নিত্য নতুন বেড়েই চলেছে— যেমন প্রথমে ছিল ‘হাইকাস্ট’ আর ‘সিডিউল কাস্ট’ বা উচ্চ জাতি আর তপশিলী জাতি-উপজাতি। তারপর এল ওবিসি বা অন্যান্য অনগ্রসর জাতি। এখন আবার তার সঙ্গে যোগ হয়েছে সংখ্যালঘু বা মুসলিম সম্প্রদায়। এই তপশীলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি ও মুসলিমদের মধ্যে আবার অসংখ্য ভাগ দেখা যাচ্ছে। যেমন মীনা, গুর্জর, কুর্মি, জাঠ, যাদব ইত্যাদি। এক কথায় এঁদের বলা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া বা ব্যাকোয়ার্ড কমিউনিটি। এই পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে আবার কম পিছিয়ে পড়া ও বেশী পিছিয়ে পড়া বলে; ভাগ করা হচ্ছে, অর্থাৎ ভাগের আর সীমা নেই।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এই এস টি, এস সি, ও বি সি, মুসলিমরাই এখন প্রথম শ্রেণীর নাগরিক আর এর মধ্যে আবার মুসলিমরা সুপার ক্লাস। কারণ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দেশের সম্পদের উপর তাঁদের অগ্রাধিকার, তাঁদের পাশপোর্ট দেওয়া হয় বিনা ঝামেলায়। তদুপরি আছে হজ করতে যাওয়ার মোটা সরকারি ভর্তুকি ও একাধিক হজ হাউস। তাঁরা সব দেশের আইনের উর্ধ্বে।

এখন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন খুললেই দেখা যায় শুধু এই এস-টি, এস-সি, ওবিসি, মুসলিমদের নিয়ে মাতামাতি। কাকে কত চাকুরী দেওয়া যায়। কাকে কত সুযোগ সুবিধা ও সরকারি সাহায্য দেওয়া যায় তাই নিয়ে দিনরাত তোলপাড়। চুলোয় যাক ওসব বসু, ঘোষ, মিত্র, দত্ত, মুখার্জি, ব্যানার্জি, সেন, দাশগুপ্ত, তিলক, সিং, প্রসাদ ইস্তক সব হাইকাস্ট। ওদের দিয়ে তো আর ভোটে জেতা যাবে না। ওরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হওয়ার উপযুক্তও নয়, তৃতীয় শ্রেণীই ওদের আসল স্থান।

এখানে বলে রাখা ভাল— এই হাইকাস্ট ও সিডিউল কাস্টের সংজ্ঞা নির্ধারিত করেছিল ইংরেজরা প্রায় একশ’ বছর আগে। তারপর আর তা পরিবর্তন হয়নি। তা করতে গেলে লালুপ্রসাদ যাদব, মুলায়ম সিং যাদব সব রে রে করে উঠবেন। একবার অযাচিত সুযোগ-সুবিধা, দাক্ষিণ্য ও আয়াস পেলে তা কি আর কেউ ছাড়তে চায়?

সহজ যোগ-বিয়োগ জেনেই যদি শুধু নামের পাশে তথাকথিত পিছিয়ে পড়া পদবীর জোরে জর্জ, ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া যায়— তবে কে আর কষ্ট করে কঠিন অঙ্ক শিখতে যাবে? ▯

চৈতন্যযুগের পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

পর্ব — ১২

খড়ার মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

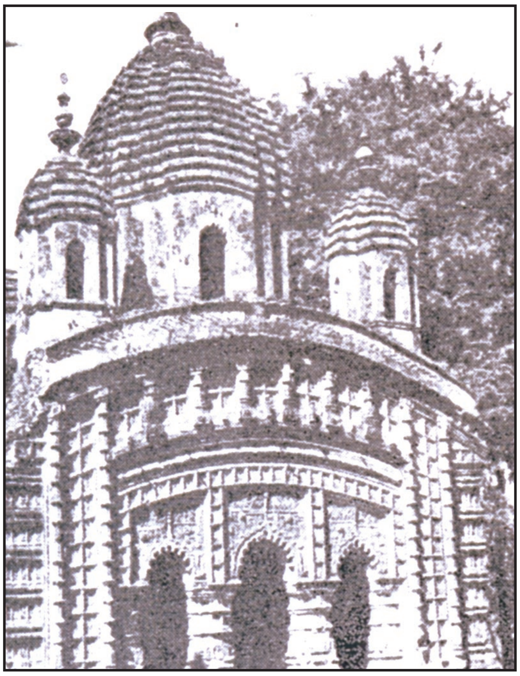

সিংহবাহিনীর 'পঞ্চরত্ন', নবগ্রাম, ঘাটাল

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ঘাটাল থানার খড়ার একটি পৌরশহর। পার্শ্ববর্তী দলপতিপুর গ্রাম খড়ার পুরসভার অন্তর্গত। গ্রামটি খড়ার শহর-সংলগ্ন। উভয় স্থানই মন্দিরবহুল। খড়ার শহর থেকে বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ বেশি দূর নয়। বরদার চক থেকে পাকা রাস্তায় উত্তরে দণ্ডিপুর হয়ে দলপতিপুরের পাশ দিয়ে কিছুটা গেলে খড়ার শহরে আসা যায়। শহরে প্রবেশের আগে পাকা রাস্তা থেকে পূর্বে অন্তত ২ কিলোমিটার দূরে 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' কাব্যের (১৭১১ খৃস্টাব্দে রচিত) বিখ্যাত কবি রামেশ্বর চক্রবর্তীর (ভট্টাচার্য) জন্মস্থান যদুপুর গ্রাম। এই পাকা রাস্তাটি ঐতিহাসিক। বহু প্রাচীনকালে এই সড়ক দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের প্রধান সরণি ছিল। তখন এর নাম ছিল 'দারির জাঙ্গাল'। দক্ষিণে বরদার চক থেকে সোজা দক্ষিণে সুপরিচিত পুরাকীর্তি স্থল পান্না হয়ে শিলাই অতিক্রম করে আঁকাবাঁকা পথে সুদূর দক্ষিণে সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্তের সঙ্গে এই সড়কের যোগাযোগ ছিল। জানা যায়, বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক সুয়ান সাঙ (হিউয়েন সাঙ) (খৃ.৭ম শতক) তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত থেকে এই রাস্তা বরাবর বহু দূরবর্তী উত্তরে কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়) উপস্থিত হয়েছিলেন। খড়ারের উত্তরে সুলতানপুরের পাশ দিয়ে সুবিশাল 'দলবার জলা'র ওপর দিয়ে এই সুপ্রাচীন সড়কটির অস্তিত্ব কয়েক বছর আগে বর্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেই বোঝা যায়, এটি সত্যিই দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের জন্য একটি প্রাচীন সড়ক ছিল। এই প্রাচীন সরণির ধারে ধারে কোনও কোনও পুরাকীর্তিস্থল লক্ষ্য করা গেছে। যেমন 'জালন্দার গড়'। মধ্যযুগে মুঘল-পাঠান শাসনকালে এটি সৈন্য চলাচলের রাস্তা ছিল (বাদশাহী সড়ক)। জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) হয়ে হুগলি, বর্ধমান জেলা মধ্য দিয়ে কখনও সোজা, কখনও আঁকা-বাঁকা পথে প্রাচীন সড়কটি কর্ণসুবর্ণে এসে মিলিত হয়েছিল। খড়ার এই প্রাচীন সড়কটির পাশে থাকায় বহু দূরবর্তী স্থানের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল সহজ। এখানের শ্রীবৃদ্ধি কতদিন আগে থেকে হয়, তা বলা কঠিন। আঠারো শতকে এটি একটি উন্নত স্থান হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। এখানের পিতল-কাঁসার ব্যবসায়ে কংসবণিক ও অন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খুবই ধনী হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতি ঘরে এই শিল্পটি সমৃদ্ধি লাভ করে। এখানের পিতল কাঁসার বাসন দূরবর্তী বহুস্থানে রপ্তানি হোত। ব্যবসায়ীরা এই শিল্পে যথেষ্ট ধনার্জন করতেন। এখানকার অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বিভিন্ন দেববিগ্রহের সেবাপূজার জন্য বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ করে, উনিশ শতকে এই স্থান যখন সমৃদ্ধির শীর্ষে অবস্থান করছিল, তখন বহু মন্দির এখানে সন্নিহিত দলপতিপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শহরে ও দলপতিপুরে বাংলা শৈলীর 'রত্ন' ও 'আটচালা'-রীতির মন্দির বেশি দেখা যায়। শহরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দিরটি হলো, মাজিদের সীতারামের 'ত্রয়োদশ-রত্ন' বা তেরচুড়া উচ্চ দেবালয়। এটি অবশ্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘাটাল মহকুমার তেরচুড়া মন্দির আমাদের আর চোখে পড়েনি। সেদিক থেকে এই মন্দিরটি একক দৃষ্টান্ত। গর্ভগৃহ প্রবেশপথের ওপরের লিপিটি এখানে দেওয়া হলো : (সারি ও বানান অনুসারে)—

'শ্রীশ্রী শ্রীতা
রামজীউ শকাব্দা ১৭৮৬
১১/২৪ শ্রীব্রজলাল মাজি সাং
উদয়গঞ্জ প° বরদা গঠনকার শ্রী
কার্তিকচন্দ্র মিস্ত্রী ও
শ্রীমাহিন্দনাথ।
মিস্তি সাং সেনহাট প° জাহানা।
বাদ সন ১২৭১ সাল তা° ২৪
চৈত্রী'

লিপি থেকে জানা যাচ্ছে উদয়গঞ্জের (খড়ারের শিষ্টবর্তী) ব্রজলাল মাজি জাহানাবাদ পরগণার (আরামবাগ) সেনহাটির দু-জন মিস্ত্রি কার্তিক চন্দ্র ও মাহিন্দ্রনাথ মিস্ত্রিকে দিয়ে এই প্রায় ৫৫ ফুট উচ্চতার মন্দিরটি নির্মাণ করান। সেনহাটির মন্দির-মিস্ত্রি বা সূত্রধরদের বেশ খ্যাতি ছিল, জানা যায়। তখন খড়ার, বীরসিংহ প্রভৃতি স্থান হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল। উনিশ শতকের য়ুরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব এই মন্দিরে স্পষ্ট। ভিনিসীয় দরজা উত্তরদিকের দেওয়ালে লক্ষ্য করা যায়। সীতারাম মন্দিরের পাশে শশিশেখর ও মৃত্যুঞ্জয় শিবের দুটি ছোট 'আটচালা' মন্দির আছে। দুটি পরবর্তীকালে নির্মিত ১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খৃ.)। শশিশেখরের মন্দির রায়ের ডাঙার বিহারীলাল মাজি প্রতিষ্ঠা করেন। কাঠের দরজার খোদাই কাজ করেন খড়ারের বনমালী মিস্ত্রি। মৃত্যুঞ্জয় শিবমন্দিরের স্থপতি ছিলেন দাসপুরের শশিভূষণ মিস্ত্রি ও সেনহাটের তিনকড়ি মিস্ত্রি। কাঠের দরজার কাজ করেন খড়ারের শ্রীপতিচরণ মিস্ত্রি। ১৩১২ সালের (১৯০৫ খৃ.) ২০ ভাদ্র এটি তৈরি হয়। লিপিতে এসবের উল্লেখ আছে। খড়ারে কংসবণিক ও সুবর্ণবণিকদের প্রতিষ্ঠিত বহু অট্টালিকা ও দুর্গামণ্ডপ লক্ষ্য করা যায়। ■

মরিশাসের মানুষ দেখা হলেই বলবে 'রাম রাম'

পরম্পরা

বালেন্দু শর্মা দাধীচ

'ভারত মহাসাগর মাঝখানে থাকলেও মরিশাস আর ভারতকে আলাদা করেনি, একসূত্রে বেঁধেছে।' কথাটা বলেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। সত্যিই, ভৌগোলিক দৃষ্টিতে অনেক দূরবর্তী হলেও মানসিক দিক থেকে খুব কাছের। মরিশাসের স্যার শিবসাগর রামগুলাম আন্তর্জাতিক পুজোপদ্ধতি আর ধর্মের উপর রয়েছে অপরিসীম আস্থা।

এই ছবি স্পষ্টভাবে দেখার জন্যে দিল্লী থেকে মরিশাস-এ যাত্রা করলেই তা পাওয়া যাবে। বিমান ছাড়ার সময় আশেপাশে তাকালে দেখা যাবে, হাতে লম্বা চুড়িপরা নবপরিণীতা তরুণীদের। যা দেখে অন্য যাত্রীদের কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। ভারতে এমনভাবে মরিশাসের প্রচার হয়েছে যার মধ্যে

মরিশাসের মন্দির আজ প্রাণবন্ত সংস্কৃতি কেন্দ্র।

বিমানবন্দরে নামার পর চারপাশ দেখে মনে হবে এতো ভারতের মধ্যেই। সর্বত্র ভারতীয় রীতিপদ্ধতি এবং হিন্দুত্বকে সহজভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখে ভালো লাগবে। তারপর কারও সঙ্গে দেখা হলে যখন আপনাকে প্রথমেই সম্ভাষণ করবে 'রাম রাম' কিংবা 'ওঁ নম শিবায়' বলে তখন কেমন লাগবে? ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বহু কিলোমিটার দূরে আফ্রিকা মহাদেশের লাগোয়া কোনও দ্বীপে যাওয়ার পর ওইরকম ভারতীয় ঘরানার প্রকাশ সর্বত্র দেখলে বিস্ময় আর মুগ্ধতা একসঙ্গে জাগা স্বাভাবিক। সেখানে ভারতের বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস, আচার-ব্যবহার, আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে, ভারত তার 'আপন দেশ' ওইরকম ভাবতে অসুবিধে থাকে না।

মন-ভরানো নির্জন সমুদ্রসৈকত, সবুজের সমারোহ, মনোরম আবহাওয়া আর সহজসরল মানুষ প্রেমিক যুগলদের অন্যরকম আনন্দ দেয়। খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা নেই, সেখানে ভারতীয় খাবার-দাবার দিব্যি পাওয়া যায়। উত্তর ভারতীয় খাবার চাইলে পাবেন, দক্ষিণ ভারতীয় খাবার পেতেও অসুবিধে নেই।

এখন মরিশাসের অধিকাংশ রাস্তা, জনবসতি এবং গ্রামের নাম ফরাসি ভাষায় হলেও কোথাও কোথাও হিন্দি নামও দেখা ও শোনা যাবে। যেমন অপ্রবাসী ঘাট, গঙ্গা তলাব (পুকুর), শিবসাগর মন্দির ইত্যাদি। লোকজন কথাবার্তা বলার সময় ক্রিয়োল ভাষা ব্যবহার করেন। যা তৈরি হয়েছে ফরাসি, আফ্রিকা, ভোজপুরী, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা মিলেমিশে। দিব্যি কাজ চলে যাচ্ছে। তবে মূল ভারতীয়রা বেশিরভাগই হিন্দি বোঝে। মরিশাসে এসে ব্যাপারটা এমন লাগল যেমন দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও জায়গায় যেখানে লোকজন হিন্দিভাষা বলে না, কিন্তু সব বোঝে। এখন অবস্থাটা ধীরে ধীরে একটু বদলাতে শুরু করেছে। নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা হিন্দি শিখছে। এইসব লোক ভারত থেকে আসা প্রত্যেক পর্যটককে নিজের আপন অতিথি ভাবে। তারা চেষ্টা করে অতিথিদের মাধ্যমে ভারতকে যতটা জানা যায় জেনে নেওয়ার। অচেনা অজানা মানুষদের কাছে হঠাৎ এমন আপনজনের মতো ব্যবহার পেলে প্রথম প্রথম বিস্ময় জাগে। কিছুদিন বাদে বোঝা যায় হিন্দি, হিন্দু ও হিন্দুস্থানের প্রতি মরিশাসের সমাজের আগ্রহে কোন কৃত্রিমতা বা দেখানোপনা নেই। এ যেন এক স্বাভাবিক ব্যাপার, যেসব মানুষ নিজেদের পূর্বপুরুষের মূল দেশ আর তার মহান সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক শুনেছেন এবং পড়েছেন কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভবের সুযোগ পায়নি। তাঁরা সেই ছিন্ন বন্ধনকে জোড়া দেওয়ার জন্যে আবেগে ভেসে ওইরকম আপন করে নিতে চান তা বোঝা যায়। এজন্যেই মরিশাস ভ্রমণ ভারতীয়দের কাছে এক আবেগ আনন্দভরা তীর্থযাত্রার মতোই।

মরিশাসের আয়তন মোটামুটি দিল্লীর থেকে দেড়গুণ। ভারত মহাসাগরের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে দক্ষিণ আফ্রিকা আর মাদাগাস্কার দ্বীপের সংলগ্ন এই দ্বীপ ভারতীয় সংস্কৃতির অদ্ভুত কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ছ'শতক আগে ইংরেজরা ভারত থেকে কুলি নিয়ে গেছে মরিশাসে। যাদের শুধু মজুর ভাবা হোত। একেবারে প্রতিকূল সামাজিক আর্থিক ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁরা নিজেদের হিন্দু

পরিচিতি আর সাংস্কৃতিক পরিচয় বিলুপ্ত হতে দেননি। পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ, যাঁরা রাজনীতিক, বর্তমান মরিশাসের ও সমাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত তাঁরা নিজেদের ধার্মিক আর সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে আরও গভীরতা দিয়েছেন।

মরিশাসের জনসংখ্যার প্রায় ৫২ শতাংশ হিন্দু। আফ্রিকা মহাদ্বীপে যা সর্বাধিক। স্থানীয় রাজনীতি সমাজ আর সংস্কৃতিতে তাঁদের প্রাধান্য রয়েছে। মরিশাসে ধর্মবিশ্বাসে একরকম জনজাগরণ এসেছে বলা চলে, যার পিছনে কোনও কোনও হিন্দু সংগঠনের কয়েক দশকের প্রয়াস জড়িয়ে রয়েছে। এইসব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, মরিশাস সনাতন ধর্মমন্দির সঙ্ঘ, মরিশাস আর্যসভা, আর্যসমাজ, সনাতন ধর্ম প্রচারিণী সভা, মরিশাস তামিল মন্দির সঙ্ঘ, মরিশাস অন্ধ্র সভা, মরিশাস মারাঠী মণ্ডলী সঙ্ঘ ইত্যাদি নিয়েছে সক্রিয় ভূমিকা। হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমস্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উদ্যোগ নিয়েছে। মরিশাসে চিন্ময় মিশন, মা অমৃতানন্দময়ী আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন, ব্রহ্মকুমারী আশ্রম ইত্যাদির শাখাও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

মরিশাসের ইংরেজের পরাধীনতা থেকে মুক্তি মেলে ১৯৬৮-তে। এর আগে সেখানে মিশনারীদের হাতে নিপীড়িত হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা করুণ ছিল, মানসিক পরিবর্তনের চেষ্টাও প্রবল ছিল। স্বাধীনতার পর সেখানকার হিন্দুসমাজে এর প্রতিবাদ দেখা যায়। তাঁরা বুঝতে পারেন জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একজোট হওয়ার গুরুত্ব কতটা।

ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের চেষ্টার দরুন সেখানে মন্দিরের সংখ্যা বাড়ছে। হিন্দুদের ধর্মচর্চা ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও উৎসবে অংশ নেওয়া বেড়েছে। মহাশিবরাত্রি উৎসব মরিশাসের সবচেয়ে বড় উৎসব। ওইসময় ৯ দিন ধরে সমস্ত পরিবেশ শিবময় হয়ে ওঠে। ভারতের বাইরে হিন্দুদের সবথেকে বড় ধর্মসম্মেলন বলা হয়। এই উপলক্ষে শুধু হিন্দু নয়, অহিন্দু মরিশাসবাসী শুধু নয়, আশপাশের দেশের হিন্দুরা একত্রিত হয়। গণেশ চতুর্থী, দীপাবলী ও অন্য ধর্মীয় উৎসব উৎসাহে পালন করার উদ্যোগ থাকে। তখন মনে হয় ভারত থেকে দূরে এই ক্ষুদ্র ভারতে অধিকাংশ মানুষ নিজেদের পিতৃভূমির সঙ্গে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক স্তরে একাকার হয়ে গেছে।

মরিশাসের বিখ্যাত গঙ্গা পুষ্করিণী দেখার সুযোগ পেলাম। যেখানে মহাশিবরাত্রি উৎসবের মূল কেন্দ্র। সেখানে যাওয়ার আগে রাস্তায় খোলা আকাশের নীচে ১০৮ ফুট উঁচু মঙ্গল মহাদেবের বিশাল, সুন্দর দিব্য মূর্তির দর্শন মেলে। এটি বরোদরার সুরসাগর ঝিলে স্থাপিত শিবমূর্তির হুবহু প্রতিরূপ। মরিশাসের গঙ্গা পুষ্করণীকে ভারতের পবিত্র গঙ্গানদীর মতো শ্রদ্ধা করা হয়। গঙ্গা পুষ্করণীতে ভগবান শিবের মন্দিরের সঙ্গে আরও কয়েকটি মন্দির আছে। এখানকার পবিত্রজলে শিব, হনুমান, গণেশ, দুর্গা ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে।

মরিশাসের হিন্দুদের মধ্যে শৈবদের সংখ্যা সর্বাধিক। মরিশাসের উত্তরে রয়েছে মহেশ্বরনাথ মন্দির, যাকে বলা হয়, ট্রায়োলেট শিবালা। এই শিবমন্দিরের মাধ্যমে হিন্দুদের পরিচয় স্পষ্ট হয় মরিশাসে।

আগে মরিশাসে এক মনোরম দ্বীপে অত্যন্ত দর্শনীয় সাগর শিবমন্দির ছিল। চারদিক থেকে আসা সমুদ্রের তরঙ্গ আর সমুদ্র-বাতাসের মধ্যে মাথা তুলে উড়ত সাগর শিবমন্দিরের ধ্বজা। যা ঘোষণা করত, মরিশাসে ভারতীয় আর আধ্যাত্মিক ভাবনার কীর্তি পতাকা সবসময় মাথা উঁচু করে থাকবে।

ধর্মচর্চার পাশাপাশি জীবনচর্চা চলেছে মরিশাসে।

মরিশাসের মন্দিরের একটা বৈশিষ্ট্য হলো মন্দিরের দেবতা যিনিই হোন না কেন অন্যান্য দেবদেবীও থাকেন। ফলে ভক্ত নিজের নিজের আরাধ্য দেবতাকে দর্শন করতে পারবেন। ভারতবংশীয়রা ঘরে ঘরে মন্দির করেছেন। সেখানে হনুমানজীর মূর্তি রয়েছে।

ওইরকম ভারতসংস্কৃতি-সমৃদ্ধ ভূমিতে মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে হিন্দু সংগঠন ও হিন্দি। প্রায় তিনশো হিন্দিভাষী মন্দিরের এক আলাদা সংগঠন আছে, যার নাম সনাতন হিন্দু ধর্মমন্দির সংগঠন। অনেক মন্দিরে হিন্দির প্রাথমিক পাঠদান পর্ব চলেছে। ছোটোদের অক্ষর লিখতে শেখানো হচ্ছে। হিন্দি সাহিত্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। হিন্দিভাষীদের সমস্ত কাজকর্মের প্রধানকেন্দ্র হচ্ছে মন্দির। ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও প্রচার প্রসারের কাজ চলেছে। এখন সবদেশে হিন্দুমন্দিরের সঙ্গে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা কেন্দ্র যুক্ত। মরিশাস ব্যতিক্রম নয়। হিন্দি সেখানে অত্যন্ত পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু সমস্ত উদ্যোগ। সব দেখে আসার আনন্দময় অভিজ্ঞতা হলো।

মরিশাসে তামিল মন্দিরও বাড়ছে। হিন্দিভাষীদের মতো তামিল ভাষীরাও মন্দিরকেন্দ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ❑ ❑

সৌজন্য : পাঞ্চজন্য ১২ আগস্ট ২০১২

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতুর উপাখ্যান

ঘুড়ি ওড়াবার মজায় মাতল হোতু

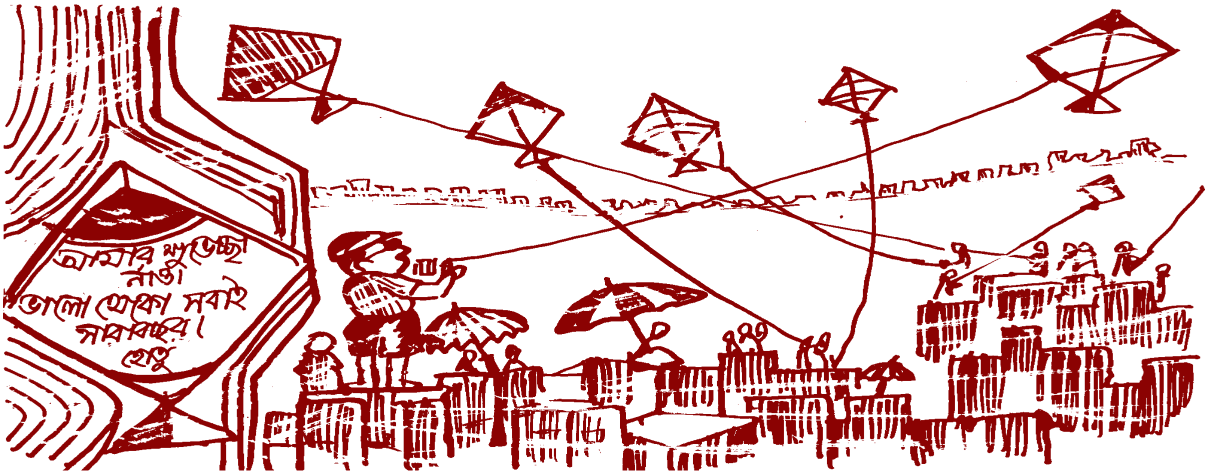

হোতু-কীর্তন সমাজে যোগ দেওয়ার পর কোতু বেশ ফুলে ফেঁপে উঠছে। তার জানা আমদানির অনেক রকম রাস্তা। টাকাকড়ি কীভাবে আসবে সেটা জানা। একটু কৌশল দরকার সেজন্যে। শুধু টাকার জন্যে ছোটাছুটি করলে সমাজে মানসম্মান থাকে না। তাই একটু জনসেবা, সংস্কৃতিচর্চা এসব করা দরকার। যেমন নেতারা করে। চোখে ঠুলি বাঁধা, পিঠে কুলো বাঁধার ব্যাপার-স্যাপার আগে ছিল। এখন নেতার কাজের কেউ ভুল ধরে না, যদি অবস্থা অনুকূল থাকে। একটু বুঝে সবকিছু করলে নেতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কেরিয়ারগ্রাফ সবসময় উপরের দিকে উঠবে। হোতুর অনেক সাধ ছিল নেতা হওয়ার। কিন্তু সে দু' পয়সা চারপয়সা নিয়ে সকলের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করে বুঝিয়ে দেয় তার মনের গণ্ডিটা একেবারে ছোট। তার দোকানে এখনও পর্যন্ত ১৬৫ জন কর্মী এসেছে, গেছে। দীর্ঘকাল টিকে গেছে শুধু দুজন। চিকলি আর শিট্টু। ওরা হোতুর মনের জোয়ার ভাঁটা ঢেউ-এর ওঠাপড়া ভালো বোঝে। তবে হোতুর মাথার মধ্যে কতরকম প্যাঁচ-পয়জার আছে তা বোঝা সম্ভব নয়। শিট্টু আড়ালে বলে, 'হোতুর মাথায় পেরেক পুঁতে দিলে স্ক্রু হয়ে বেরিয়ে আসবে।' কোতু আরও সেয়ানা। সে কোন্ মতলবে কখন থাকে তা বোঝা সম্ভব নয়। কোতু অনেক ঘাটে জল খেয়েছে। বিস্তর অভিজ্ঞতা। হোতু কাউকে কাছাকাছি ঘেঁষতে দেয় তখনই, যখন অঙ্ক মিলে যায়। কিংবা মেলানোর চেষ্টা করা যায়।

হোতু ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসে— এটা চিকলির কাছে জানতে পারল কোতু। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে হোতু সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ছাদে কাটায়। হোতুরা উত্তর কলকাতায় যে বাড়িতে থাকে সেটি দোতলা পুরনো দিনের বাড়ি। অনেকগুলো ঘর। উঠোন বারান্দা। ছাদ। বাগান। হোতু বাড়িটার এখন দখলদার। দুশো টাকায় বাড়িটা ভাড়া নেওয়া। আবার চারটে পরিবারকে ভাড়া দিয়েছে মোটা টাকা সেলামিতে। বাড়িওয়ালা গোকুল সাহা বলেছে, 'হোতুবাবু বাড়িটা আপনি নিয়ে নিন। আমার তো ট্যাক্সের পয়সাই উঠছে না।'

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ছুটি। হোতু ব্যবসায় বেরোয় না। খাবার দাবার নিয়ে ছাদে ওঠে। ছাদে কয়েকটা বাগান-ছাতা রাখে। সেইসঙ্গে চেয়ার, সতরঞ্চি পাতা। সকাল থেকেই অনেকরকম খাবারের জোগান থাকে। হোতু আগে মাঞ্জাটাঞ্জা দিতো। এখন সুতো লাটাই ঘুড়ি সব কেনা। কোন ঘুড়ির কি নাম তা জেনেছে ছেলেবেলায়। কীরকম হাওয়া পেলে কোন ঘুড়ি ওড়ে ভালো তাও জানা। প্রতি বছর বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্যে বাজেট ধরা থাকে পাঁচ হাজার টাকা। খুব চেনা দোকান থেকে ঘুড়ি ওড়ানোর জিনিসপত্র চলে আসে আগের দিন। হোতুর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন থাকে। হোতুর ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা আছে। তামাক বা অন্যান্য নেশা নেই। তা পছন্দও করে না। তবে পাড়া-বেপাড়ার ছেলেরা হোতুর একটার পর একটা ঘুড়ি কেটে দিলে সে মুখ গোমড়া করে থাকে। তারপর বলে, 'আরে এটাই তো মজা। ছেলেরা ঘুড়ি কাটবে। আমি আবার ওড়াবো।' হোতু যে দু-একটা ঘুড়ি কাটে না তা নয়। সে কারও ঘুড়ি কাটতে চায় না। অনেক উঁচুতে ঘুড়ি তুলে ভাসিয়ে রাখতে চায়। এতে আনন্দ। হোতু পাঁচ ডজন ঘুড়ি কেনে প্রতি বছর। প্রতিটি ঘুড়িতে লেখা থাকে : 'আমার শুভেচ্ছা নাও। ভালো থেকো সারা বছর।' হোতুর নামও লেখা থাকে।

কোতু বলেছিল, সে ঘুড়ি ওড়াতে পারে ওস্তাদের মতো। কিন্তু হোতু বুঝেছে কোতুর যত দৌড় সব মুখেই। হোতু বলল কোতুকে, 'তুমি খাও, ঘুমোও। অনেক খাবার রয়েছে।' কোতুর চোখ চকচক করে উঠল। সে অনুমতি পেয়ে খাওয়া শুরু করে দিলো। খাচ্ছে, শুচ্ছে। আর মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে, 'দারুণ দারুণ হোতুদা। চালিয়ে যান।' হোতু ঘুড়ির সুতো ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'তোমার কাজ চালিয়ে যাও।' চিকলি আর শিট্টু ওইদিন আসে না। তারা নিজেদের পাড়ায় ব্যস্ত থাকে। অনেক কারখানায় ঘুরে আসে। ভালো প্রসাদ মেলে।

হোতু ঠিক করেছে, একটা ঘুড়ির মতো আকারের বই করবে নিজের লেখা দিয়ে। কোতু প্রস্তাব শুনে বলল, 'দারুণ দারুণ।'

হোতু বলল, 'পরের বছর ঘুড়ি ওড়ানোর জন্যে একটু পুরস্কার চালু করলে কেমন হয়?'

কোতু আবার বলল, 'দারুণ দারুণ। কি করা যায় দেখছি।'

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

বই দাও, বই দাও, ছোটোদের বই দাও

ঘরের চারপাশে বই সাজানো থাকে পীতারুণ স্যারের। কোন্ বইটায় কি আছে তা জানা আছে তাঁর। না পড়ে জমিয়ে রাখার অভ্যেস নেই। অনেকে বই না পড়ে শুধু জমায়। টাকা খরচ না করে জমিয়ে যায়। জামা-কাপড় না পরে রেখে দেয়। ওরকম জমানোর অভ্যেস পীতারুণ স্যারের নেই। তিনি পছন্দের বই প্রয়োজনের বই সংগ্রহ করেন নিয়মিত। বই হাতে আসার পর তা ভালোভাবে দেখে নেন। ছাপা বাঁধানোর কোনও ত্রুটি থাকলে দেখে নিলে তা ধরা পড়বে। বই ব্যবহারের জন্যে। যত্নে রাখতে হবে ব্যবহারের পরে।

আবার কেউ কেউ খুব যত্ন করে বইয়ের। একটুও পড়ে না। সুন্দর দামী আলমারি থাকে। সাজানো বই চকচক করে। কিন্তু তার পাতা কেউ খোলে না। ‘বই নষ্ট হয়ে যাবে ব্যবহার করলে’ এমন ধারণা যাদের থাকে তাদের বই অনুরাগে যথেষ্ট ফাঁকি রয়ে যায়। আমরা ওইরকম সংগ্রহ বাতিক গ্রাহকদের পছন্দ করি না।

বই ব্যবহার হবে। যত্নে ব্যবহার করলে অবস্থা ভালো থাকবে। বই তো ব্যবহার হবে শেখার জন্যে। রেখে দিলে কি শেখা যায়! খুব ছোটোরা বই ছেঁড়ে বলে এক অভিভাবক বই কিনে দিতেন না। এক শিক্ষক ছোটোরা বই ছিঁড়লে খুশি হতেন। ছিঁড়তে ছিঁড়তে বইকে ভালোবাসবে। বই ব্যবহার না হলে বইয়ের মূল্য বোঝা সম্ভব নয়।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন কবে প্রতিষ্ঠিত? সদর দপ্তর কোথায়?

২. সায়েন্স কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কোথায় হয়? সভাপতি কে ছিলেন?

৩. বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার কি? যাঁর নামে পুরস্কার, তাঁর পুরো নাম?

৪. বীরেশ গুহ কে ছিলেন? তাঁর নামে কলকাতায় কোথায় রাস্তা আছে? তিনি সমস্ত সম্পত্তি কোথায় দান করে যান?

৫. ‘বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।’ কথাটি কার?

উত্তর : ১. ১. ১৯১৩। কলকাতায় পার্ক সার্কাসে ২. এশিয়াটিক সোসাইটিতে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ৩. ভাটনগর। শান্তিস্বরূপ ভাটনগর। ৪. বিজ্ঞানী। পার্ক সার্কাসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানচর্চার জন্যে। ৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছোটোদের বলছি

উলটো পালটা

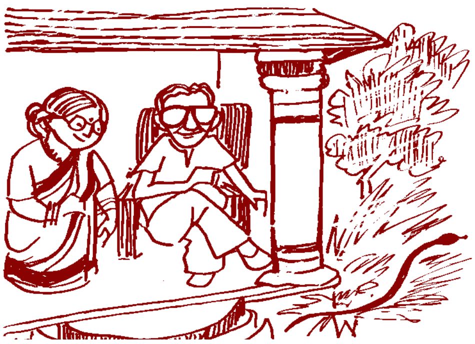

রাস্তার লাগোয়া বৈঠকখানায় বসে সন্ধ্যেবেলা রামশঙ্কর মুখুজ্জে পথচলতি সকলকে ডাকেন, ‘কে যায়?’ চোখে ভালো দেখতে পান না। গলা শুনে বোঝেন চেনা, না অচেনা মানুষ। কে একজন চলে গেলো, শব্দ পেলেন। যথারীতি প্রশ্ন করলেন, ‘কে যায়?’ উত্তর এলো না। একটু রাগ হলো তাঁর। বললেন, ‘সাড়া তো দিলো না, যে গেল!’ গিন্নি পাশে ছিলেন। বললেন, ‘কে সাড়া দেবে! ওতো শুকনো তালপাতার উপর সাপ যাওয়ার আওয়াজ।’

।।২।।

অজয় সিমলাই ভোজনরসিক। তাঁর কাছে কোনও খাবার এলে প্রথমে অন্যদের দেন। অল্পমাত্রায়। তারপর নিজে বেশির ভাগটা খান। বলতেন, ‘সবাইকে দিয়েই তো খাচ্ছি।’ কিন্তু তিনি একটা গান রোজই গেয়ে থাকেন, ‘চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।’ নাতি বিপুল বেজায় বদমাশ। সেদিন আড়াইশো গ্রাম রাবড়ি এনে সবাইকে দিয়ে দাদুকে এক চামচে দিয়ে বলল, ‘চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়!’

রামগরুড় সংকলিত

দাম্পত্য জীবনের অধিকারে স্ত্রীর সন্তান ধারণ কি আইনে বাধ্যতামূলক?

পাশের বাড়ির কৃষ্ণার মাসখানেকের ওপর বিয়ে হয়েছে। স্বামী বরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সুপুরুষ। দু'জনেই খুশিতে ডগমগ। হঠাৎই শুনলাম কৃষ্ণার মার কাছে, দু'জনে পাড়ি দিয়েছে সিঙ্গাপুরে সাতদিনের জন্য। অফিস যাওয়ার পথে মনে হলো কৃষ্ণাকে ওদের ঘরে দেখলাম। ফিরে এসে খোঁজ নিলাম কৃষ্ণা ফিরেছে কিনা। কৃষ্ণার মার মুখে যা শুনলাম শুনে স্তম্ভিত হলাম। হাসিখুশি মেয়েটির মুখের হাসি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। মুখ খুলে কিছু বলছে না। মা তো! তাই অনেক বলে-কয়ে মেয়ের মুখ থেকে কথা বার করেছেন। ব্যাপারটা হলো— বরুণ ওকে সন্তানধারণ করার জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণা রাজি নয়। এ নিয়েই অশান্তি। আচ্ছা, বিয়ে করেছে বলে কি মেয়েটি সব সত্তা বিকিয়ে দিয়েছে? এর জন্য বাধ্য করলে আইনে কি কিছু করা যায় না! হ্যাঁ, যায়। জানালেন আইনজীবী অরুণা মুখোপাধ্যায়।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে অনেকসময় একটা অপ্রীতিকর মন্তব্য স্ত্রীকে শুনতে হয় যদি তিনি সন্তানসম্ভবা না হন বা ইচ্ছুক না হন, মন্তব্যটি ওই স্ত্রীকে তাঁর স্বামী বা অপর কোনও ব্যক্তি বা স্ত্রীলোক করেন এই মর্মে যে সন্তানধারণে স্ত্রীকে বাধ্য করানোর জন্য স্বামীরও অবশ্য কর্তব্য আছে, যেহেতু স্বামীরও এবিষয়ে অধিকার আছে।

এখন প্রশ্ন হলো, আইনগতভাবে সত্যই কি স্ত্রীকে সন্তানসম্ভবা হবার জন্য স্বামীর তরফ থেকে স্ত্রীকে বাধ্য করানো যেতে পারে? এর উত্তরে জানাই, বিচারের রায়ে বলা হয়েছে যে স্ত্রীকে সন্তান ধারণের জন্য বাধ্য করানোর ক্ষমতা স্বামীর নেই। উচ্চ আদালতের মতে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের ভালবাসা, আন্তরিকতা, নিকটবর্তী হওয়া একটি বস্তু কিন্তু সন্তানের জন্মপ্রদান হলো স্বতন্ত্র বিষয়। অধিকন্তু সন্তানধারণ ও জন্মপ্রদান হলো স্ত্রীর পক্ষে অসহ্য বেদনাদায়ক ও ক্লেশযুক্ত, ঠিক সেই কারণেই এই ব্যাপারে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে বাধ্য করানোর ক্ষমতা আইনগতভাবে স্বামীর অধিকার বহির্ভূত। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা উচ্চআদালতের মাননীয় বিচারপতি জীতেন্দ্র চৌহান এই বিষয়ে রায় প্রদানে মন্তব্য করেছেন--- "দাম্পত্য অধিকারসমূহে কেবলমাত্র সম্মতি প্রদান অর্থে সন্তানের জন্মপ্রদানের সম্মতির অর্থ বোঝায় না। গর্ভাবস্থা চলমান থাকবে কিনা অথবা ভ্রূণমোচন করার জন্য স্ত্রী ইচ্ছুক কিনা সেই বিষয়ে বিচারের রায় সম্পূর্ণ স্ত্রীর উপর বর্তাবে।' এটি সুস্পষ্ট যে বিত্তশালী, ধনী, দরিদ্র স্বামী অথবা অসুস্থতার কারণে স্ত্রীকে ভ্রূণমোচনের অধিকার থেকে বাধাপ্রদানের ক্ষমতা স্বামীর নেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই রায়টি পুনঃপরীক্ষার জন্য চন্ডীগড় দাখিল করেছিলেন যেটির ভিত্তিভূমিতে ছিলেন যৌনবিশারদ চিকিৎসক মঙ্গলা ডোগরা ও অন্যান্য দরখাস্তকারী। এই ক্ষেত্রে স্বামীর সম্মতি ব্যতীত স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত ভ্রূণমোচন-এর সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। স্বামী এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন স্ত্রীর দ্বারা বিরাট একক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।

ঘটনার প্রসঙ্গে বলা যায় ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ হয় ও তাঁদের পুত্রসমেত একত্রে পাণিপথে শুরুতে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কলহ ও খারাপ সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণে স্ত্রী শেষ পর্যন্ত তাঁর পুত্রসন্তান সমেত পিতামাতার কাছেই চন্ডীগড়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। খোরপোষের দরখাস্তও স্ত্রী এই সময় দাখিল করেন। তবে কলহ প্রশমিত হয়ে আসে পরবর্তীকালে ও পাণিপথেই স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী আবার সহবাস করেন ওই খোরপোষের দরখাস্ত চলাকালীন সময়ে। স্ত্রী এই সময় ভ্রূণমোচন করার জন্য ইচ্ছুক হন ও এটির ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত হন চিকিৎসক মঙ্গলা ডোগরা, যাঁকে সাহায্য প্রদান করেন চিকিৎসক সুখবীর গ্রীয়াল।

এর পরেই স্বামী একটি দেওয়ানী মামলা রুজু করেন ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য স্ত্রীর বিরুদ্ধে, স্ত্রীর ভাই ও পিতামাতার বিরুদ্ধে। যেহেতু স্ত্রীর দ্বারা তিনি মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লেশের ভারে অবসাদগ্রস্ত হয়েছেন। এছাড়া বেআইনীভাবে ভ্রূণনাশ করার জন্য তিনি চিকিৎসক মঙ্গলা ডোগরা ও চিকিৎসক সুখবীর গ্রীয়ালের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনেন। এইক্ষেত্রে বাদীর সমর্থনে যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল বিবাদীদের বিরুদ্ধে (স্ত্রী ও অন্যদের বিরুদ্ধে)। তবে সময় অপচয় না করে চিকিৎসক মঙ্গলা ডোগরা ও অন্যান্য বাদীগণ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনঃপরীক্ষার দরখাস্ত দাখিল করেন।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানার উচ্চআদালতের মাননীয় বিচারপতি জিতেন্দ্র চৌহান উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনানীর পরে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য রায় প্রদান করেন স্ত্রীর সমর্থনে। এতে বলা হয় 'স্ত্রী তাঁর স্বামীর প্রতি দাম্পত্য কর্তব্য বিষয়ের প্রতি অবগত ছিলেন নিশ্চয়ই। সুতরাং যদি স্ত্রী যৌন সঙ্গমের জন্য স্বামীকে সম্মতি প্রদান করে, স্বামীর সঙ্গে যৌন-সঙ্গম স্থাপন করে থাকেন, সেটির অর্থ এই নয় যে তিনি সন্তানসম্ভবা হবার জন্য স্বামীকে মত প্রদান করেছেন। সন্তানের জন্ম প্রদানের ইচ্ছা স্ত্রীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছা— বাধ্যতামূলক নয়। স্বামীর মুখ্য অথবা গৌণ সম্মতি এক্ষেত্রে মূল্যহীন। ▯

বেণীপ্রসাদ উবাচ : ‘দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে আমি খুশি’

শ্যামল কুমার হাতি

নির্বাচনের সময় এলে সাধারণ মানুষ ভোট দেয়। ভোট দেয় তারা শুধু সরকার গঠন করার জন্য নয়। সাধারণ মানুষ চায় সেই সরকার তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এমনটা কেউই চায় না যে সেই সরকার তাদের ব্যাপারে উদাসীন থাকবে। মানুষ দু'বার ইউপিএ জোটকে ভোট দিয়েছে। নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দলের প্রচারে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়েই তাদের ভোট দিয়েছে এই কথা তারা বর্তমানে বলছেন। আজ এই সাধারণ মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকেছে। প্রথম ইউপিএ-র সময় মানুষ তাদের সঙ্গে বামপন্থীদের দেখেছে। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারে মানুষ তাদের সঙ্গে তৃণমূলকেও দেখেছে। এদের সমর্থনেই সরকার বিরোধীদের সব বাধা অতিক্রম করে গদিতে অটল থেকেছে। জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য। চাল, ডাল, তেল, চিনি, আনাজপত্র, গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, বিদ্যুৎ সবকিছুর দামই অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। কমেছে শুধু মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ২০০৯ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ১৫ আগস্ট দিল্লীর লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা তোলার পর তাঁর ভাষণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, ততই পাল্লা দিয়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। সরকার চুপচাপ কাটপুতলির মতো সবকিছু দেখছে। ব্যবস্থা নেব, ব্যবস্থা নেব বার বার বলার পরও কেন দাম কমেনি? দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার গঠনের সময়ে এবং পরেও তারা আশ্বাস দিয়েছিল ১০০ দিনের মধ্যেই দাম কমিয়ে দেবেন। কই দাম তো কমেনি। যারা সরকারি চাকুরী করেন, যারা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কাজ করেন বা যারা করর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করেন অথবা যারা বড় বড় শিল্প সংস্থায় কাজ করেন জিনিসের দাম বাড়লে তারা ডি এ বা দুর্মূল্য ভাতা পান। অন্যরা কি তা পান? যারা বাঁধা মাইনেতে কাজ করেন তাদের সংখ্যা তো ৮৮ শতাংশ। তাদের কথা কে ভাববে?

অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের পর যখন সোনিয়া-মনমোহন সরকার গঠন করেন তখন দেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির গড় দর ছিল ৩ শতাংশ। আজ তা বেড়ে প্রায় ৭ শতাংশ। দু'দফায় এন ডি এ সরকারের সময় বাজার দর স্থির ছিল। চাল, ডাল, তেল, চিনির দাম বাড়েনি। সেই সময় একবার পিঁয়াজের ঝাঁজেই দিল্লীর সরকারে শীলা দীক্ষিতকে বসতে সাহায্য করেছিল। আজ আর সোনিয়ার সেই ঝাঁজ নেই কেন? সরকারি হিসাবই বলছে এপ্রিল ২০০৪ থেকে এপ্রিল ২০১২-তে আনাজপত্রের দাম বেড়েছে ১৭১.৬ শতাংশ, চালের দাম বেড়েছে ৮৫.৫ শতাংশ, গমের দাম ৮৩.৪ শতাংশ। এখন তো আরও বেশী। সরকারের আরও একটা হিসাব বললে বোঝা যাবে দাম কিভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে— (সারণী দ্রষ্টব্য ঃ ১ নং)

সারণী (১ নং)

রাজ্য	বর্ডারের দৈর্ঘ্য কিমি.	বেড়া দেওয়ার জন্য অনুমোদন	বেড়া দেওয়া সম্পন্ন হয়েছে	খোলা বর্ডার দৈর্ঘ্য
অসম	২৬৩	২৩০.০৩	২২১.৫৬	৮.৪৭
মিজোরাম	৩১৮	৩৫২.৩৩	২০৬.০০	১৪৬.৩৩
মেঘালয়	৪৪৩	৪৭০.২৩	৩৮০.০৬	৯০.১৭
ত্রিপুরা	৮৫৬	৮৫৬.০০	৭৩০.৫০	১২৫.৫০
পশ্চিমবাংলা	২২১৬.৭০	১৫২৮.০০	১২২২.০০	৩০৬.০০
মোট	৪০৯৬.৭০	৩৪৩৬.৫৯	২৭৬০.১২	৬৭৬.৪৭

(স্টেটস্‌ম্যানের সৌজন্যে)

সরকারের যোজনা কমিশনের উপপ্রধান ডঃ মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ার হিসাবে "দেশের ৩০ কোটির সামান্য বেশী জনগণের দৈনিক রোজগার ২৮ টাকা।" সরকারের হিসাবে ২০১০ সালে সারাদেশে ১৫,৯৯৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। স্বরোজগার যোজনায় নিযুক্ত ২০১২ সালে প্রায় ২৬০০০ ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। এরা সবাই ঋণে জর্জরিত হয়েই আত্মহত্যা করেছে।

আর তখনই কিনা মনমোহন সরকারের ইস্পাতমন্ত্রী বেণীপ্রসাদ বর্মা বুকের ছাতি ফুলিয়ে বলেছেন— "দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে আমি খুশী"। বুঝুন সরকারের প্রকৃত অবস্থাটা কি? চাল, গম, তেল, ডাল, চিনি এবং আনাজপত্রের দাম বাড়ায় মন্ত্রীমশাই খুশী। এর থেকে আর মজার ব্যাপার আর কি কিছু আছে? কিছুদিন আগে চিদাম্বরম সাহেবও মধ্যবিত্তদের নিয়ে মজা করে বলেছেন, "এরা ১৫ টাকা লিটার জল খাবেন, ২০-২৫ টাকার আইসক্রীম খাবেন, কিন্তু জিনিসের দাম ১ টাকা বাড়লে চিৎকার করবেন"। যারা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনলস কাজ করবেন, যারা অতি সাধারণ মানুষের ভোটে সরকারে এসে তাদের জন্য কাজ করবেন তা নয় এরা এখন তাদের নিয়ে মজা করতেই ব্যস্ত। এদের তো ঘাড়ধাক্কা দিয়ে মন্ত্রিসভা থেকে বার করে দেওয়ার কথা, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিরুপায়। এখানে শুধু দুটো জিনিসের কৃষকদর এবং বাজারদর দিচ্ছি। শুধু সেটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে দাম বাড়ায় কাদের পকেট ভরছে বা কারা খুশী হচ্ছে?

	কৃষকদর প্রতি কিলো টাকায়	বাজারদর প্রতি কিলো টাকায়
অড়হর ডাল	৪০	৭০
মুগডাল	৪২	৮৫

এছাড়াও দাম বাড়ার আরও একটা কারণ আছে। তা হলো চোরা পথে বিদেশে এই সব সাধারণ মানুষের খাবার পাচার হচ্ছে। আমাদের সব আছে, সরকার আছে, বি এস এফ আছে। সব চেয়ে বেশি আছে মাঝখানে চিচিং ফাঁক। ভারত ও বাংলাদেশের বর্ডারের বিরাট ফাঁকই হলো চিচিং ফাঁকের সমান। জিনিসপত্র মানুষ সবকিছুই অবাধে চলাচল করছে। এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার তা হলো দাম বাড়াতে কৃষকের পেট ভরেনি। গরীব ও মধ্যবিত্ত মানুষের উপকার হয়নি। তা হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দাম বাড়ায় খুশী কিসের জন্য? ▯

বংশানুক্রমিক শাসন ও জাতপাত : গণতন্ত্রের মৃত্যুঘণ্টা

অতিথি কলম

এম ভি কামাথ

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা উদ্ধৃত করার মতো বাণী সচরাচর দেনই না। নীরব অবলোকনই তাঁর বেশি পছন্দের। তবে হালে তিনি ক'টি শব্দ উচ্চারণ করেছেন যেগুলির প্রতিটির অন্তর্নিহিত অর্থই দেশের বর্তমান পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সুপ্রযোজ্য। জয়ললিতা বলেছেন সাধারণ মানুষ এমন মনে করে— 'There is no Government at the Centre'। এত কম শব্দে বাস্তব পরিস্থিতি ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। কেন তিনি জনতার এই উপলব্ধির কথা বললেন সেটি একটু বিচার করা যেতে পারে।

(১) প্রধানমন্ত্রীর কথাই ধরুন কোনও হিসেবেই তাঁকে রাজনৈতিক নেতা ভাবার কোনও সুযোগ তিনি দেননি। কেননা কখনই তিনি যথার্থ নেতার ভূমিকা নেননি। দীর্ঘদিনের এই আমলাকে দেখে দেশবাসী কোনওদিনই অনুপ্রাণিত বোধ করেনি। বক্তব্য রাখার সময় তাঁর ক্লান্তিকর কণ্ঠস্বর তাঁর ভাবলেশহীন মুখচ্ছবি মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। বরাত জোরে তিনি হয়তো ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন অবধি টিকে যাবেন। তবে সব দলের কাছেই একটা নিশ্চিত বার্তা যাবে যে জ্ঞান থাকতে আর কখনও কোনও আমলাকে দেশের প্রধানমন্ত্রী বানিও না। মনমোহন সিং প্রমাণ করেছেন তিনি একাই একটি সরকারের ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট।

(২) তিনি এমন একজন নেতা যাঁকে কোনও নীতি নির্ধারণের জন্যে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে অনুমতি নিতে হয়। হ্যাঁ, সোনিয়া গান্ধীই তাঁর (মনমোহনের) মুখ দিয়ে হ্যাঁ বা না বলাবেন। অথচ দেখুন সকলেরই চোখে পড়বে যে ভারতের সঙ্গে সনিয়ার কোনও আত্মিক সম্পর্ক নেই। আশ্চর্যের বিষয় কেউই জানে না হিন্দু ধর্মের সম্বন্ধে তাঁর মতামত বা অবস্থান কি? রাহুল গান্ধী থেকে থেকে দাবী করেন তিনি একজন ব্রাহ্মণ। তিনি সহজেই ভুলে যান তাঁর ঠাকুরমা বিয়ে করেছিলেন একজন পার্সী ধর্মাবলম্বীকে আর তাঁর নিজের বাবার বিয়ে হয়েছিল একজন ইটালিয়ান ক্যাথলিকের সঙ্গে। মন্দিরে যাওয়ার প্রশ্নে ইন্দিরা গান্ধীর কোনও ছুৎমার্গ ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি প্রায়শই মন্দিরে গিয়ে তিনি তাঁর হিন্দুত্বের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন। কিন্তু সোনিয়ার অবস্থান কি? আচ্ছা, গত জুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের যে ১১১তম মৃত্যু দিবস গেল সে ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য কি?

নির্বাচনের পর নির্বাচনে কংগ্রেসের ধারাবাহিক পরাজয় দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক ভবিষ্যতের সূচক। কেননা নোংরা হয়নি এমন একটি দল বিজেপি রয়েছে। এই পরিবারতন্ত্রহীনতাই সেই দলের শক্তি। অন্দরে খেয়োখেয়ি করে তারা যেন সুযোগ না ছেড়ে দেয়। দেশের কথা ভেবেই তাদের একতাবদ্ধ থাকা দরকার। দেশবাসীকে সত্যিকারের গণতন্ত্র উপহার দেওয়ার দায়িত্ব আজ বিজেপি'র ওপরই বর্তায়।

ভারত ও পরিবারতন্ত্র :

দেশের আজকের এই পরিস্থিতিতে যদি কারুর পথনির্দেশ বা প্রজ্ঞা দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে তা স্বামীজীর। তিনিই তো জাতিকে আত্মসম্মানে বলীয়ান করেছিলেন। সোনিয়া গান্ধীর কি কোনও দূরাগত সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও স্বামীজী সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে? আশঙ্কা হয়— নেই। হাজার ভনিতা করে ভারতীয় প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও তিনি কখনই সঠিক ভারতীয়ত্বের নাড়ী ধরতে পারবেন না। কেবল একজন ভারতে জন্মানো, ভারতে বেড়ে ওঠা মানুষই কংগ্রেসকে যথার্থ নেতৃত্ব দিতে পারে। তাই সোনিয়াকে যেতেই হবে। একথা বলতে পারেন কংগ্রেস তাহলে তাঁর ওপর এতটা নির্ভর করল কেন? তার মূল কারণ সেই সময় সীতারাম কেশরীর ছত্রছায়ায় পার্টি তলিয়ে যাচ্ছিল। সঞ্জয় গান্ধী জীবিত থাকলে তিনিই নিশ্চিতভাবে দলের হাল ধরতেন এবং কালক্রমে তাঁর মায়ের জায়গা নিতেন।

অন্যদিকে রাজীব গান্ধী যদি খুন না হয়ে যেতেন তাহলেও সোনিয়া গৃহবধূই থাকতেন। দল যখন নেতাহীন, দিশাহীন অবস্থায় ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন সদস্যদের মনে হলো একজন বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারীকে মাথায় বসাতে পারলে দল ঘুরে দাঁড়াতে পারে। এখানে মানতেই হবে ভারতীয় সমাজ ও তার ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে তাঁরা একটা

বংশানুক্রমিক শাসনের কবলে থাকলেই বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এই দেশ এক সময় মুঘল সম্রাট, নিজাম-নবাব, মহারাজা পেশোয়াদের অধীনস্থ থেকেছে। শাসনকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাফল্যের পক্ষে অধিবাসীদের বশ্যতা স্বীকারের পক্ষে যথেষ্ট। সেই পরম্পরা অনুযায়ীই লোকসভা নির্বাচনে বাপের পর ছেলে দাঁড়িয়ে পড়ছে। নামগুলো দেখলেই প্রবণতাটি খোলসা হয়ে যাবে— যাদবকুল, সিন্ধিয়ারা, দেওরা পরিবার, হরিয়ানার হুডারা, ঠাকুরবাহিনী— বাপের তক্তে বসে পাড়া এমনই সব নাম। দিল্লীতে আমরা যা মনে করি কংগ্রেসের শাসন চলছে তা সর্বৈব ভুল। সেখানে দেশ চলছে তথাকথিত 'হাই কম্যান্ডের' নির্দেশে। আজকাল ঠারে-ঠোরে এর বিরোধিতা শোনা যাচ্ছে। কেননা এই হাই কম্যান্ড নির্দেশিত পরিকল্পনা অনেক নির্বাচনেই মুখ থুবড়ে পড়ছে। উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে মুছে গেছে কংগ্রেস।

পরিবারতন্ত্রের টক্কর :

দেখেশুনে মনে হয় কংগ্রেসকে আবার ক্ষমতায় ফিরতে গেলে পরিবারতন্ত্রের প্রায় লাটে ওঠা দোকানটিকে বন্ধ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশের ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধ্রের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী রাজশেখর রেড্ডীর দুর্নীতির জন্য বরাবরই নামডাক ছিল। কিন্তু এনিয়ে দল কখনও নজর করত না কেননা ভোট খরচ বাবদ ও পার্টি চালানোর জন্য তাঁর কালো ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ থাকত। এহেন বাবার ছেলে বাবা মারা যাওয়ায় স্বভাব বশেই ভেবেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটিতে তাঁর পৈতৃক অধিকার রয়েইছে। তবে বেআইনী অর্থ সংগ্রহে ছেলে জগন নাকি বাপকে টেক্কা দিয়েছে। ৩৬ লক্ষ টাকার সম্পদকে সে ১০ বছরের মধ্যেই অবিশ্বাস্যভাবে ১৬ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকায় রূপান্তর করার যাদু দেখিয়েছে। এর পরেও কি তার বাবার জায়গায় এ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার অধিকার জন্মায় না? আশপাশের লোক বলছে জগন নাকি হাই কম্যান্ডের কথা শুনতে গড়িমসি করেছে। আরে বেয়াদপ! একে তো সব শেখাতে হয়। কিন্তু রতনে যে রতন চিনে ফেলেছে! পরিবারতন্ত্র জগনেরও এতটাই রক্তে মিশে গেছে যে সে হাইকম্যান্ডের চোখে চোখ রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য তাকে মূল্যও চোকাতে হচ্ছে। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো অন্ধ্র বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনে ১৮টি আসনের মধ্যে জগনের দল ১৫টি আসন দখল করেছে। লোকসভার একমাত্র আসনটিও তাদেরই পক্ষে গেছে। ইতিমধ্যে হিসাব-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে তার জেলবাসের ব্যবস্থাও দিল্লীর পারিবারিক শাসনের উত্তরাধিকারীরা করেছে। কিন্তু অন্ধ্রের ভোটারদের কাছে এগুলি অপ্রয়োজনীয় তথ্য। তারা জানে জগন রাজশেখরের ছেলে। আর পৈতৃক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ জগনও জানে ভোট কি করে আদায় করতে হয়। টাকা, টাকা, টাকা সর্বত্রগামী। আর জগন কোনও কিছু লুকোছাপা করেনি। তার স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে যে বাড়ী দেখানো হয়েছে সেটিতে ঘরের সংখ্যা ৪০ আর সঙ্গে ওড়াউড়ির সুবিধের জন্য একটি হেলিপ্যাড আছে। ভবিষ্যতে কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে সমাধা করার জন্য আর একটি গৃহ বর্তমানে নির্মীয়মাণ। এটির অনুমোদিত নির্মাণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৪টি এসকালেটর, ১০টি লিফট, ২০০ জন বসার মতো একটি প্রেক্ষাগৃহ, ৬০টি বসবাস কক্ষে মূল্যবান পাথর বসানো ছাড়াও স্কোয়াস, টেনিস ও ভলিবল কোর্ট থাকবে। এছাড়া একটি অফিস কমপ্লেক্স নকশায় রয়েছে। আবাসগৃহ ও অফিস কমপ্লেক্স-এর চাকর-বাকরদের থাকার জন্য থাকছে ২০টি ভৃত্য মহল। হায়রে আমবানীরাও হয়তো হিংসায় গর গর করবে।

সত্যি কথা বলতে দুর্নীতি অন্ধ্রে কোনও হৈ হৈ করার ব্যাপার নয়। টাকার জোরই আসল সত্য। বিশেষ করে যদি বংশানুক্রমিক শাসকদের হাতে টাকা থাকে। টাকাই ক্ষমতাকে ঘরে আনে। ক্ষমতাই পরিবারতন্ত্রকে মদত দিয়ে জিইয়ে রাখে। গণতন্ত্র যায় আঁস্তাকুড়ে। কেউ কি মনে রেখেছে হায়দরাবাদের চরম অত্যাচারী শেষ নিজামটি রাজ্যে উর্দুকে সরকারি ভাষায় হিসেবে চাপিয়ে দেন।

তবে, তাঁর সময় তো তিনি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। সেটাই স্মরণে রয়েছে। এই পরিবারতন্ত্রের মডেলই চালু রয়েছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকায়। হাতে গরম উদাহরণ পঞ্জাব, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল, মেঘালয়, উত্তরপ্রদেশ এমনকি ওড়িশাতেও। এই কুশ্রী ঘরানা ভারতীয় রাজনীতির পঙ্গুত্বের আর এক উপসর্গ জাতপাতকেও ম্লান করে দিচ্ছে।

জাতপাত :

পাঞ্জাবে শিখত্বই শেষ কথা। শিরোমণি অকালী দল যা বলবে তার ওপর আর কথা নেই। উত্তরপ্রদেশে মুলায়মের জাতপাতের কু-মিশ্রণ তো সদ্যই দেখা গেল। কর্ণাটকে ইয়েদুরাপ্পা প্রায় মাইক নিয়ে ঘোষণা করছেন তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী না করলে লিঙ্গায়েত ভোট আর বিজেপি পাবে না। এটি সরাসরি ভীতিপ্রদর্শন।

কোন মুখে আমরা দাবি করব আমরা গণতান্ত্রিক ভারতে থাকি? দেশের মধ্যে গেড়ে বসা পরিবারতন্ত্রের কুৎসিৎ মুখটিকে আড়াল করার জন্যই আমরা গণতন্ত্রের মুখোশ পরেছি। কংগ্রেস এখন আর জনগণের দল নয়। এটি একটি পারিবারিক সংগঠন এবং অনাদিকাল স্থায়ী হবে বলেই নখ দাঁত বিস্তার করছে। যদি না পরিবার শুদ্ধ তুলে ইতিহাসের ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়। অবশ্য সুখের কথা বিদায় লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে। নির্বাচনের পর নির্বাচনে কংগ্রেসের ধারাবাহিক পরাজয় দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক ভবিষ্যতের সূচক। কেননা নোংরা হয়নি এমন একটি দল বিজেপি রয়েছে। এই পরিবারতন্ত্রহীনতাই সেই দলের শক্তি। অন্দরে খেয়োখেয়ি করে তারা যেন সুযোগ না ছেড়ে দেয়। দেশের কথা ভেবেই তাদের একতাবদ্ধ থাকা দরকার। দেশবাসীকে সত্যিকারের গণতন্ত্র উপহার দেওয়ার দায়িত্ব আজ বিজেপি'র ওপরই বর্তায়।

(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক, ইলাসট্রেটেড উইকলির প্রাক্তন সম্পাদক ও প্রসার ভারতীর ভূতপূর্ব ডিরেক্টর)

নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ এরাজ্যকেও অসমের মতো বারুদের স্তূপে পরিণত করেছে

একলব্য রায়

চলতি বছরের জুলাই মাসে নামনি অসমে আরও একটি দাঙ্গা হয়ে গেল। সরকারি তথ্য বলছে ৮ আগস্ট ২০১২ পর্যন্ত এই দাঙ্গায় মৃত্যু হয়েছে ৭৮ জনের, ৪০০টিরও বেশি গ্রাম থেকে চার লক্ষেরও বেশি মানুষ ঘর ছাড়া হয়ে ২৭০টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, নিখোঁজের সংখ্যা ১১। বেসরকারি মতে মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা যদিও অনেকটাই বেশি। এই লেখা পাঠানো পর্যন্ত অর্থাৎ আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহেও শুধু অসমের নতুন নতুন এলাকায় নয়, দাঙ্গা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সমস্ত ভারতবর্ষেই। মুম্বাই-এ প্রতিবাদ সভার নামে লাগানো দাঙ্গায় দু'জনের মৃত্যু হলো। হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালুরুতে উত্তরপূর্ব ভারত থেকে পাঠরত ও কর্মরতদের সন্দেহভাজন মুসলিম মৌলবাদীরা হুমকি দিচ্ছে, চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছে। ফলে প্রাণভয়ে ভীত সন্ত্রস্তদের ফিরিয়ে আনার জন্য উত্তরপূর্ব ভারতমুখী বিশেষ ট্রেন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। পরিস্থিতি থেকে এটা পরিষ্কার যে এই দাঙ্গার মূল দেশের ভেতরে বাইরে সমান ভাবে প্রসারিত।

প্রশ্ন হচ্ছে এমন একটি ভয়ংকর দাঙ্গা লাগলো কেন? অসম পুলিশ ও আরও কয়েকটি সূত্রের মতে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতির হাতে চারজন বোড়ো যুবকের মৃত্যুর পর গত ২০ জুলাই থেকে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। বোড়ো সম্প্রদায়ের মানুষের সন্দেহ বাংলাদেশি মুসলমানরা তাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে এলাকায় দখলদারি কায়েমের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত উপায়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। রিপোর্ট বলছে এই হত্যাকাণ্ডের বদলা হিসেবে সশস্ত্র বোড়ো সম্প্রদায়ের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম মহল্লাগুলিতে। অগ্নি সংযোগ করা হয় বসত বাড়ি থেকে শুরু করে স্কুল বাড়ি এমনকি যানবাহনেও। গুলি চালানো হয় স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে। পাল্টা আঘাত হানে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও। ঘটনাক্রম থেকে এটা পরিষ্কার যে বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র বোড়ো সম্প্রদায়ের চার যুবকের মৃত্যুর বদলা হিসেবে এতবড় দাঙ্গা লেগে গেল এটা হতে পারে না। বরং বলা যায় ওই এলাকায় দাঙ্গা সৃষ্টির পটভূমি তৈরি হয়েই ছিল যাতে কিনা চার যুবকের মৃত্যু অগ্নি সংযোগ করেছে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত এই ক্ষোভের আগুনে।

দাঙ্গার এই পটভূমি সম্পর্কে দুটো মত আছে। এক, গত শতাব্দীর আটের দশকের বোড়ো সিকিউরিটি ফোর্স ও বোড়োল্যান্ড লিবারেশন টাইগার ফোর্সের মতো কিছু সংগঠন বাংলাদেশের ভারত-বিরোধী শক্তির প্রত্যক্ষ মদতে পৃথক বোড়োল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে ধংসাত্মক সশস্ত্র আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সেতু, কালভার্ট, রেলপথ ও রেলগাড়ি।

বোড়ো জঙ্গিদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে নাজেহাল হয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের সম্মতিতে ১৯৯৩ সালে সংসদে বোড়োল্যান্ড অটোনমাস 'কাউন্সিল অ্যাক্ট' পাশ হয়। নানা কারণে এতেও হিংসাত্মক কার্যকলাপ থামলো না। এরপর এন ডি এ ক্ষমতায় এলে বোড়োদের দাবি মতো আরও বেশি ক্ষমতা ও এলাকা নিয়ে ২০০৩ সালের ৬ ডিসেম্বর গঠিত হয় ২৭,১০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)। তথ্য বলছে উদালগুড়ি, কোকরাঝাড়, চিরাং ও বাকসা বিটিসির অন্তর্ভুক্ত এই চারটি জেলায় বোড়োরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। বাংলা, অসমিয়া, সাঁওতাল সহ বিভিন্ন অবোড়ো হিন্দু সম্প্রদায় ও বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায় বিটিসির এলাকায় যৌথভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বিশ্লেষকদের একটি অংশের মতে বোড়োরা নাকি অবোড়ো জনগোষ্ঠীকে বিটিসির এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে শুধুমাত্র নিজেরাই ওই এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে বসবাস করতে চায়। এই বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৯৮ সালের বোড়ো—সাঁওতাল দাঙ্গার উদাহরণ টেনে আনা হচ্ছে। ওই ঘটনায়ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। এই বিশ্লেষকদের আরও বক্তব্য বর্তমান দাঙ্গায় মুসলিম সম্প্রদায়ের গায়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী তকমা লাগিয়ে বিটিসির এলাকা ছাড়া করার পর অবোড়ো হিন্দু গোষ্ঠীকেও একই হাল করা হবে। এই ধরনের বিশ্লেষণে আংশিক সত্যতা থাকলেও এতে প্রকৃত বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ জন্মের ৬৫ বছর হয়ে গেলেও যেখানে পাকিস্তানী মুসলমানরা সার্বভৌম ক্ষমতা পেয়েও ওই দেশকে অমুসলমান শূন্য করতে পারেনি সেখানে ভারতীয় সংবিধানের আওতায় থেকে বোড়োরা সীমিত প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ে তাদের এলাকাকে অবোড়ো শূন্য করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তাছাড়া বোড়োরা তো শুধু বিটিসি এলাকাতেই আটকে নেই। এদের একটা ভালো অংশ শিক্ষিত হয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবাস করছে। সেজন্য পারস্পরিক সহাবস্থানের গুরুত্ব অনুধাবন করার মতো মানুষ বোড়ো সমাজের মধ্যে তৈরি হয়নি এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে যাই হোক বোড়ো জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে যদি এই ধরনের সহাবস্থান-বিরোধী মনোভাব থেকে থাকে তাহলে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ সহ যেন-তেন-প্রকারেণ এদের সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস চালাতে হবে।

দুই, বিশ্লেষকদের একটি অংশের মতে

এক সময়ের উগ্র অসমিয়া সম্প্রদায়বাদী আন্দোলনের ফলে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে অসমিয়া ও বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে বিরোধের ফলে বহু হিন্দু অসম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হওয়াতে অনেক জায়গাতে খোদ অসমিয়ারাই এখন সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। হিন্দু সমাজের এই দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস শুধুমাত্র নামনি অসমের বিটিসি এলাকাতেই নয় প্রায় গোটা অসমেই দাঙ্গার পটভূমি তৈরি করে রেখেছে।

২০০১-এর জন গণনায় অসমের ২২টি জেলার মধ্যে ৬টি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ৪টি জেলায় মুসলমানদের একক বৃহত্তম সম্প্রদায় হিসেবে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ২০১১-তে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা চমকে দেওয়ার মতো। এতে দেখা যাচ্ছে গত দশ বছরে অসমের অর্ধেক জেলাই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। একটি রিপোর্ট বলছে ১৯৭২ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত অসমে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৮৮.৮৮ শতাংশ যেখানে সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪.৬৭ শতাংশ। তথ্য বলছে কমপক্ষে ৩২টি বিধান সভানির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত করছে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরাই। সন্দেহ নেই মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের লোভই অসমকে আজ বারুদের স্তূপে পরিণত করেছে।

একথা এজন্যই বলতে হচ্ছে যে গুজরাতে ২০২ কিলোমিটার পাকিস্তান সীমান্ত থাকলেও অনুপ্রবেশের সংখ্যা শূন্য। পাঞ্জাব ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ সাল এই তিন বছরে দেশের পশ্চিম সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্পূর্ণ করেছে। অথচ অসমে ১৯৮৫ সাল থেকে শুরু করে মাত্র ২৬২ কিলোমিটার বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কাজ ২০১২ সালেও শেষ হয়নি। অথচ অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ব্যাপারটি নিয়ে অতীতেও বহুবার হইচই হয়েছে। যেমন ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সইকিয়া বলেছিলেন ওই রাজ্যে ত্রিশ লক্ষ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। ২০০৩ সালে সে সময়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নানডেজ বলেছিলেন এদেশে দুই কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। ২০০৫-এ অসমের গভর্নর অজিত সিংহ বলেছিলেন অসমে প্রতিদিন গড়ে ৬০০০ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ঢুকছে। তবে এদেশে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের মতো রাজনৈতিক দল ও একশ্রেণীর মিডিয়া যতই একাযোগে মুসলিম অনুপ্রবেশের ব্যাপারটি অস্বীকার করুক না কেন বিবিসির মতো অনেক বিদেশি মিডিয়াই অসমের বর্তমান ঘটনার জন্য সরাসরি মুসলিম অনুপ্রবেশকেই দায়ী করেছে।

মুসলিম অনুপ্রবেশ বিতর্কে সৃষ্ট এই দাঙ্গায় উত্তরবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের সম্পর্কে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতার বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে অসমের মতো পশ্চিমবঙ্গও অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে খাদ্যের কিনারায় চলে এলেও উনি অসমের ক্ষমতাসীনদের মতো ভোটব্যাঙ্কে চোখ রেখেই চলতে চান। কারণ অসমের মুখ্যমন্ত্রী ওই রাজ্যের শরণার্থী শিবিরগুলি থেকে আগস্ট মাসে মধ্যেই তাদের ভিটেতে ফেরানোর চেষ্টা করলেও মমতা বলেছেন শরণার্থীরা যতদিন খুশি এরাজ্যে থাকবেন, রাজ্য সরকার তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কোনরকম পরিচয় (বাংলাদেশি কি না) যাচাই না করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই 'মানবিক' প্রয়াসে উৎসাহিত যশোডাঙ্গার মোসিন পাড়া, রহিমাবাদ, সাদারিহাট ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন মসজিদে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের অনেকেই এখানে পাকাপোক্ত ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে ফেলেছে, আবার অনেকে করছে। যেমন রিপোর্ট বলছে, শামুকতলার পুকুরিয়া গ্রামে ইতিমধ্যেই তিনটি শরণার্থী পরিবার স্থায়ী বসবাসের জন্য ঘর তৈরি করে ফেলেছে, শরণার্থীদের পরিচয় নিয়ে এই উদাসীনতা বলে দিচ্ছে বামেদের মতো মমতাও মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ভোটব্যাঙ্ক গড়তে সমান আগ্রহী। নির্লজ্জ মুসলিম তোষণের মানসিকতা-প্রসূত এই ধরনের 'উদারতা' যে এরাজ্যকেও অসমের মতো বারুদের স্তূপে পরিণত করছে এ বিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে সমস্যার মূলে গিয়ে কি বর্তমান দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানের সৎ সাহস আদৌ কি কোনওদিন কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো ছদ্মধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির হবে? অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলিম ও প্রকৃত ভারতীয় মুসলিমদের চিহ্নিত করে বিদেশিদের বিতাড়িত করার মতো কোনও নীতি প্রণয়নের মতো সৎসাহস কি এ সমস্ত মেকিধর্মনিরপেক্ষ দলের আছে? দেশভাগের কারণ ও ইতিহাস উল্লেখ করে এই সমস্ত দলের কি এটা বলার ক্ষমতা আছে যে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আগত মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারী আর ওই সমস্ত দেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা হিন্দুরা শরণার্থী?

এই সমস্ত প্রশ্নের সবকটির উত্তর যে না হবে একথা একটি শিশুও বোঝে। ফলে দেশ হিসেবে ভারত যতই শক্তিশালী হোক না কেন এদেশ যারা চালায় তাদের প্রাণভ্রমরা যে মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্ক আশ্রিত এই দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। এজন্যই বিদেশিরা এদেশে শুধু বাইরে থেকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে মদত নয় প্রত্যক্ষ ভাবে দাঙ্গা করতে সাহস পায়।

দেশের বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয়তো অচিরেই সাময়িক শান্ত হয়ে আসবে। কিন্তু রাজনীতির দাদাদের হাতে দেশের ও নিজেদের ভাগ্য সমর্পণ করে দিয়ে অনুপ্রবেশ-বিরোধী তীব্র জনমত গড়ে তুলতে না পারলে, 'ভোটাররা বলবে যে দলের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশকারীদের মদতের অভিযোগ আছে তাদের একটিও ভোট নয়'। হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সমন্বয়ে এমন পাল্টা ভোটব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে না পারলে, হিন্দু সমাজের সংহতি তথা জাতীয় ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করে 'আমরা অসমিয়া, আমরা বোড়ো' জাতীয় স্থানীয় সেন্টিমেন্ট জড়ানো ক্ষোভ বিক্ষোভের আন্দোলন পরিচালিত না হলে অসমের মতো দেশের অনেক জায়গাতেই তৈরি হয়ে থাকা সুপ্ত আগ্নেয়গিরিগুলি থেকে যে মাঝে মাঝে লাভা উদ্‌গিরণ হতে থাকবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। □

বদরুদ্দিন আজমল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে ভারতে : হাগ্রামা মহিলারি

■ **অসমের জঙ্গলে সন্ত্রাসবাদীর জীবন কাটানোর পর মূল স্রোতে ফিরেই আপনি বি টি সি (বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল)-এর চেয়ারম্যান। এরপর কি?**

■ বি টি সি-র হাতে এখনও স্বরাষ্ট্রদপ্তর নেই। আমরা এটা চাই। যদি আমার হাতে স্বরাষ্ট্রদপ্তর থাকত তাহলে আমি খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারতাম। মানুষকে এত দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়তে হোত না। বর্তমান পরিস্থিতিই বলছে বি টি সি-কে স্বরাষ্ট্র বিভাগ প্রদান করা উচিত।

■ **বোড়ো বিধায়ক প্রদীপ ব্রহ্ম গ্রেপ্তার হয়েছেন। এর ফলে কি অসম রাজ্য সরকারের সঙ্গে আপনার দলের মোর্চার প্রভাব পড়বে?**

■ বিগত দশবছর যাবৎ আমাদের যৌথ মোর্চা রয়েছে। এত সহজেই কি তাতে চিড় ধরতে পারে? আমরা তরুণ গগৈ সরকারকে সমর্থন করে যাব। বোড়ো প্রতিবাদকারীরা বলছেন— পুলিশ শ্রী ব্রহ্মর সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করেনি। ২০ জুলাই চারজন বোড়ো যুবককে যারা হত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যার ফলে এত রক্তপাত ও হিংসা ঘটে গেল। বিক্ষোভকারী বোড়োরা আরও বলছে— প্রদীপ ব্রহ্ম'র অপরাধ প্রমাণসাপেক্ষ। পুলিশ একরোখা (বায়াসড্) ছিল, এজন্য অসম সরকার দায়ী নয়, আমার মনে হয় স্থানীয় প্রশাসনই ভুল করেছে। যে চল্লিশটি বিভাগ বি টি সি-কে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 'আইনশৃঙ্খলা' নেই। সেজন্য আমরা নিরুপায়।

■ **আপনি বলছেন, বোড়োরা নিজ বাসভূমিতেই নিরাপদ নয়?**

■ বি টি সি-র এলাকায় সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দেখুন। একজন পুলিশ অফিসারের সামনেই চারজন বোড়ো যুবককে হত্যা করা হলো, অথচ হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। এরপর আর কি বলা যেতে পারে?

■ **কি করে এই বোড়ো বনাম মুসলমান সংঘর্ষ থামানো যায়? এতজনের মৃত্যুর পরও যা থামার কোনও লক্ষণ নেই।**

■ একটি চিরস্থায়ী সমাধান আছে— সকল অবৈধ অভিবাসীদের (পড়ুন বাংলাদেশী মুসলমান) বহিষ্কার করা হোক। তাদেরকে বিতাড়িত করা হোক, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

■ **বাংলাদেশীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, যারা বেআইনীভাবে এদেশে ঢুকে পড়েছে— তাদের কারণে বোড়ো সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, জীবনযাপন ও শান্তি সংকটাপন্ন— আপনি একথাই বলতে চাইছেন?**

■ হ্যাঁ। ঠিক তাই। তবে শুধু বিটিসি

হাগ্রামা মহিলারি

এলাকামাত্র নয়। এটা দেশের সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্যই ভয়াবহ বিপদ। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই এই বিষয়টা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

■ **যদি তারা অবৈধ, বেআইনী তাহলে কারা তাদেরকে এত বিরাট সংখ্যায় ভারতে ঢুকতে দিচ্ছে? আপনি কি মনে করেন বি এস এফ এবং 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' (বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী) এজন্য দায়ী?**

■ আমি দাবী করেছি— বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পূর্ণভাবে সীল করে দেওয়া হোক, বদরুদ্দিন আজমলের (এ আই ইউ ডি এফ প্রধান এবং ধুবড়ির সাংসদ) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এসবের পিছনে সে-ই রয়েছে। সে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে স্বাগত জানাচ্ছে।

■ **এটা কি ঠিক একটা দুষ্টচক্র (Racket) অবৈধ অভিবাসীদের ভারতীয় প্রমাণপত্র যোগাড় করে দিচ্ছে? আপনারই দপ্তরের লোকেরা এই দুর্নীতির জন্য দায়ী?**

■ হ্যাঁ, কতকটা তাই। কিন্তু একাজ বিটিসি-র পদাধিকারীরা করছেন না। বিটিসি-র হাতে ওই ক্ষমতাই নেই। অথবা আটকানোরও ক্ষমতা নেই।

■ **অবৈধ মুসলমানদের নাম করে ভারতীয় মুসলমানদেরকে কি লক্ষ্য করা হচ্ছে না তাদের জমি-জায়গা দখল করার জন্য?**

■ না, আদৌ নয়। কোনও ভারতীয় মুসলমানের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা হয়নি। এটা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে জনরোষ। ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়। ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছুই হয়নি।

■ **বোড়ো এবং মুসলমান— উভয়গোষ্ঠীর মৌলবাদীরা কি এই অশান্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে না?**

■ এখানে হুজি (HUZI), মুলটা (Muslim United Liberation Tiger of Assam) এবং ইউনাইটেড মুসলিম ন্যাশন্যাল আর্মি ছাড়া অন্য কোনও মৌলবাদী গোষ্ঠী নেই। তারা শুধু এখানেই নয়, সারা ভারতেই সমস্যা সৃষ্টি করছে।

■ **আপনি আপনার লোকেদের (বোড়ো) ভালোবাসা ও আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন। এই দুঃসময়ে তাদের প্রতি আপনার নির্দেশ কি?**

■ আমি সকল শ্রেণীর মানুষকে শান্তি বজায় রাখতে এবং সংযম পালন করতে আবেদন জানাচ্ছি।

■ **যারা আপনাকে কাছ থেকে জানেন তাদের কথায় আপনি নাকি খুব কঠোর, নির্দয় অথচ এক নরম মনোভাবাপন্ন দিকও আপনার মধ্যে আছে। প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টা ঠিক?**

■ মানুষ আমাকে জানে। তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন।

■ **আপনার পরিবার ও ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বলুন। তাদের সঙ্গে কীভাবে সময় কাটান?**

■ আমার দুই যমজ পুত্র। তারা আমাদের ভাষা সংস্কৃতি জীবনযাপন শিখুক। দিল্লীতে আমার স্ত্রী গবেষণারত বিয়ের আগে থেকেই। এখন তো ছেলেদের জন্য সময়ই পাই না। আমি ইউরো কাপ এবং বিশ্বকাপ ফুটবলের কোনও খেলা মিস্ করি না।

সৌজন্যে : টাইমস অফ ইন্ডিয়া

অন্য রকম

ত্রিশূরের 'পাইড পাইপার'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'পাইড পাইপার' শব্দটার অর্থ জানেন? ইংরেজি ভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় আলংকারিক অর্থে এর মানে হলো, যে ব্যক্তি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মানুষকে ভ্রান্ত পথে চালনা করেন। সাধারণভাবে শব্দটি যে প্রশংসাসূচক নয় তা সহজবোধ্য। ত্রিশূরের বাসিন্দা পেশায় কুটিরশিল্পী উন্নিকৃষ্ণন পাক্কানার-এর মতো একজন সৎ, সাহসী ও উদ্যোমী তরুণের প্রসঙ্গে এহেন বিশেষণ প্রয়োগে তাই প্রথমে অবাক-ই হতে হয়। কিন্তু তাঁর কুটিরশিল্পের বহর দেখলে মনে হবে, না 'পাইড পাইপার' কোনও নিন্দাসূচক শব্দবন্ধনী নয়, একটা 'প্রশংসাসূচক' অর্থ হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে পাক্কানারের ক্ষেত্রে। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে কে এই উন্নিকৃষ্ণন পাক্কানার যিনি কিনা একক কৃতিত্বে প্রায় পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন একটা ইংরেজি শব্দের অর্থের? বিষয়টা তবে খোলসা করি।

ধরুন আপনি দেখলেন ৬৪ সদস্যের একটি দল অর্কেস্ট্রার মতো বাদ্যযন্ত্র, সেতার এবং ঢাক নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে। আপনি উদ্যোক্তাদের কাছে এও জানলেন কেরলের ত্রিশূরের এই দলটি ঘণ্টা দেড়েকের অনুষ্ঠানের জন্য পারিশ্রমিক নেয় স্বদেশে ৫০,০০০ থেকে ১ লক্ষ টাকা এবং বিদেশে ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া যাতায়াত, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি খরচ তো রয়েছেই। শুনে পুলকিত বোধ করতেই পারেন, আহা, এমন দামি একটা দলের আর তস্য দামি তাদের বাদ্য-যন্ত্রের এহেন অনুষ্ঠান দেখা কি চাট্টিখানি ব্যাপার! এরপর আপনাকে যদি বলা হয় ওই বাদ্যযন্ত্রগুলি বাঁশের কঞ্চি আর পাতা দিয়ে তৈরি তবে কেমন লাগবে? তবে এসব হলো গিয়ে যদির কথা। আপাতমস্তক বাঁশের তৈরি বাদ্যযন্ত্র যে সুরের ঝংকার তোলে, বিশ্বাস করুন সত্যি বলছি এর কাছে আসল বাদ্যযন্ত্রও কোনও কোনও সময়ে হার মানতে বাধ্য হবে। অতি সম্প্রতি মুলাপাদুম রাভু (সহজ বাংলায় ভারতীয় লোক-সংস্কৃতি অনুষ্ঠান)-তে কীবোর্ড, গিটার, ঢাক ইত্যাদি বাঁশে তৈরি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে চমৎকার এক অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে এই সঙ্গীতগোষ্ঠীটি।

বাঁশ নিয়ে শিল্পকর্ম আমাদের দেশের বড় একটা কম হয়নি। কিন্তু সুরমূর্ছনার ক্ষেত্রে বাঁশের তৈরি আর আসল জিনিসের সুর-বিক্ষেপে কোনও পার্থক্য নেই, এঘটনা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। এঁদের মধ্যমণি অবশ্যই উন্নিকৃষ্ণণ পাক্কানার। ২০০৫ সালে ঘুরে যায় তাঁর জীবনের মোড়। বাঁশের স্বরযন্ত্র তৈরির আগ্রহ ছেলেবেলা থেকেই। ওই বছর সরকারি অনুদানে আয়োজিত বাঁশ-উৎসবের সে স্টেজ পারফরম্যান্স করার সুযোগ পায়। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। এখনও পর্যন্ত দেশে-বিদেশে মিলিয়ে শ'দেড়েক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়ে গেছে পাক্কানার আর তার দলের। বলা হয়নি, ৬৪ জনের একটি দলও ইতিমধ্যেই একক প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছেন তিনি, যার কিছু উল্লেখ প্রবন্ধের গোড়াতেই আপনারা পেয়েছেন।

পাক্কানার বলছেন, ''বাঁশগাছের পাতা এবং কঞ্চি সূর্যালোক এবং বৃষ্টিতে বিকশিত হয়। সুরের নিষ্কর্ষ বেরোনোর সময় তখনই। স্বরবিক্ষেপ অনুযায়ী সুরসৃষ্টি করা যায় এইভাবেই।'' জানালেন বাঁশের তৈরি স্বরযন্ত্রের অধিকাংশই তাঁর বাড়িতে তৈরি। তাঁর বয়স এখন চল্লিশ। জনজাতি যুবকদের নিয়ে বাঁশের স্বরযন্ত্র তৈরির পাঠশালা খুলেছেন আথিপাল্লী-তে। সঙ্গীতপ্রেমীরা কিছু না জেনেই চলে যাচ্ছে তাঁর কাছে। সঙ্গীতের সুরমূর্ছনার ঘোর লেগে থাকা বাদ্যযন্ত্রগুলো যে আদতে বাঁশের তৈরি কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তাদের। তাই 'পাইড পাইপার অব্ ত্রিশূর' নামেই আপাতত পরিচিত হয়ে উঠেছেন উন্নিকৃষ্ণণ পাক্কানার। ☐

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(নে
মাত্র দুই মিনিটে ৈর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন,
বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

সফল কেরিয়ার গড়তে

স্থায়ী আয়ের এক সুবর্ণ সুযোগ!!!

মাধ্যমিক পাশ যে কোন ব্যক্তি/গৃহবধূ/বেকার ভাই-বোন/কলেজ ছাত্র-ছাত্রীরা স্থায়ী আয়সহ জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে সত্বর যোগাযোগ করুন।

ভারত সরকারের ১নং অর্থনৈতিক সংস্থা L.I.C.-র অন্যতম Chief Adviser

সোমক ব্যানার্জী — মোবাইল—৯৮৩০৪১১৬৩৫

আপনি জানেন কি??

L.I.C. তার এজেন্টদের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে তা সাধারণ কোন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরিজীবিদের থেকে অনেক বেশি।

L.I.C.-র এজেন্টদের সুযোগ-সুবিধার কিছু অংশ

- নির্দিষ্ট একটা আয়
- পেনশন
- টার্ম ইনসিওরেন্স (২ লক্ষ টাকা)
- গাড়ি/মোটর সাইকেল কেনার জন্য ঋণ (বিনা সুদের হারে)
- গ্রাচুইটি (২ লক্ষ টাকা)
- প্রতি বছর গ্যারান্টি বোনাস
- গৃহঋণ (নামমাত্র সুদের হারে)
- ছেলে-মেয়ের জন্মদিন বা বিবাহের জন্য অগ্রিম অর্থ।

"এজেন্সী প্রফেশন" জীবনের লক্ষ থাকে না, কিন্তু এই প্রফেশন জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব জীবনে প্রতিষ্ঠার বড় বাধা।

নেত্রদান মহাদান

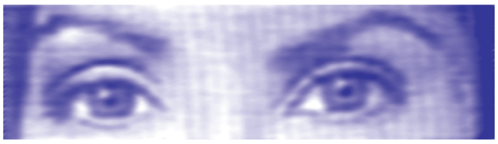

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature...................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

সংস্কৃত শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

সংবাদদাতা।। সম্প্রতি হালিশহরে অসম বঙ্গীয় সারস্বত মঠে সংস্কৃত ভারতী'র উদ্যোগে দশদিনব্যাপী সংস্কৃত শিক্ষকদের আবাসিক সংস্কৃত প্রশিক্ষণবর্গ অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৬ আগস্ট সন্ধ্যায় প্রশিক্ষণ বর্গের উদ্বোধন করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান শ্রীমৎ স্বামী বেদতত্ত্বানন্দ মহারাজ, নিগমানন্দ মঠের সম্পাদক স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী মহারাজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ উপস্থিত ছিলেন। এবার পঞ্চম আবাসিক বর্গের পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলা থেকে ১৯৮ জন শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অধ্যাপক এবং ৪৪ জন মহিলাও অংশগ্রহণ করেন।

সংস্কৃত ভারতীর অখিল ভারতীয় প্রকাশন প্রমুখ চমূ কৃষ্ণশাস্ত্রী বর্গ পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীদের সরল সংস্কৃত কথোপকথন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেন। বর্গের শিক্ষার্থীরা স্থানীয় কয়েকটি বিদ্যালয়ে গিয়ে সংস্কৃতের ব্যবহারিক প্রয়োগ অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃত বিষয়ে সরলভাবে প্রশিক্ষণ দেন। এছাড়া বর্গে যোগদানকারী সকলে একদিন সকালে স্থানীয় এলাকায় শোভাযাত্রা সহকারে নগর পরিক্রমা করে।

আশ্রমের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় ৩০ জন শিক্ষক ও ব্যবস্থাপক বর্গ পরিচালনা করেন। বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত ভারতী'র সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দিনেশ কামত। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাহা ইনস্টিটিউট অফ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বৈজ্ঞানিক ডঃ সত্যবান ভুঞা ও ডঃ অমিত ভট্টাচার্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীমদ্ জ্ঞানানন্দ সরস্বতী। ২৬ আগস্ট বর্গ শেষ হয়। সব মিলিয়ে বর্গ সফল এবং পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতের জনপ্রিয়তা যুবক-যুবতীদের মধ্যে দিন দিন বেড়ে চলেছে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। শ্রীদিনেশজী দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক সমিতির পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেন--- সাধারণ সম্পাদক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ, শিক্ষণ প্রমুখ স্বপন বিশ্বাস এবং সদস্য কাশীনাথ নন্দী ও সমিত দে। এবার জেলায় জেলায় সংস্কৃত ভারতী'র বিশেষ বর্গ ও জেলা সমিতি গঠনে জোর দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

শোক সংবাদ

সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক তথা বর্তমানে বর্ধমান জেলার সহসম্পর্ক প্রমুখ প্রদীপ চৌধুরী (গোপাল)-র পিতা সঞ্জয় চৌধুরী গত ১ সেপ্টেম্বর শক্তিগড় উত্তরবাজারস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীদের রেখে গেছেন।

* *

বাঁকুড়া শহরের স্বয়ংসেবক, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক, অকৃতদার ডাঃ বহুশঙ্কর রায় (৮৩) গত ২৩ আগস্ট পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর চার ভাই, দুই বোন ও তাদের ছেলেমেয়েদের রেখে গেছেন।

ভারত বিকাশ পরিষদের ‘পুকার ২০১২’

প্রতিবছরের মতো এবারও ভারত বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে গত ২৫ আগস্ট কলকাতার লবণহ্রদের রবীন্দ্র-ওকাকুরা ভবনে আয়োজিত হলো দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ‘পুকার ২০১২’। লবণহ্রদের বিভিন্ন স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বর্তমানে রাজ্যের মন্ত্রী রবি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিবেক বাহিনীর অধ্যক্ষ স্বামী শিবপ্রেমানন্দজী মহারাজ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় অনাবাসী ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’র মন্ত্র উচ্চারণ করে ও ভগিনী নিবেদিতার ভারতবর্ষ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করে দেশক্তির সুরে মূল অনুষ্ঠানটিকে বেঁধে দেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে স্বামী শিবপ্রেমানন্দ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, মূল্যবোধের শিক্ষা নিতে ছাত্র সমাজ প্রস্তুত। কিন্তু আমরাই তা দিতে পারছি না। ঠাকুর স্বামীজী’র পথ অনুসরণ করেই যে সে-ই অভীষ্টে পৌঁছনো যাবে একথা স্মরণ করানোর পাশাপাশি তা উপলব্ধি করাতে সেই সভাগৃহে মিনিট পাঁচেক ধ্যানও করান তিনি। অনুষ্ঠানে রবি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বাঙালি-ই প্রথম জাতীয়তাবোধ তৈরি করেছিল সারা দেশে। হিন্দুমেলার মধ্যে আমরা সেই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ দেখেছিলাম। তারপর তার জাগরণ হয় ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বিরচিত আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্গত ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। ভারত ছেড়ে এখন ইন্ডিয়ায় পর্যবসিত হয়েছি বলেই আমাদের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব দেখা দিচ্ছে। বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের খণ্ডিত স্বাধীনতাকে ঘৃণা করতেন।’ বর্তমান রাজনীতি দেশপ্রেম শূন্য বলেও মন্তব্য করেন রাজ্যের মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা ‘হাম করে রাষ্ট্র আরাধন’, ‘সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান’, ‘সুরয বদলে চন্দ্র বদলে’, ‘বান এসেছে মরা গাঙে’, ‘কভিনা রুখ সাকে’, ‘কারার ওই লৌহ কপাট’ ইত্যাদি গান গেয়ে শোনান। বিচারকের আসন গ্রহণ করেছিলেন তিনি সঙ্গীতশিল্পী সুপ্তি চৌধুরী, রঞ্জন মুখার্জি ও অমিত ঘোষ।

মঙ্গলনিধি

সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ নিবাসী, সঙ্ঘের উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রচার প্রমুখ গৌতম বিশ্বাস এবং তার ভাই কালিয়াগঞ্জ নগর কার্যবাহ ভাস্কর বিশ্বাস— এই দুই জনের বিবাহের বৌ-ভাতের দিনে দুই নবপরিণীতা বধূদের হাত দিয়ে সঙ্ঘের সেবাকার্যের উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকা ‘মঙ্গলনিধি’ প্রদত্ত হলো।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রপ্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত ওই মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গৌতম এবং ভাস্করের মা শ্রীমতী কৃষ্ণা বিশ্বাস রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির বিভাগ কার্যবাহিকা এবং সেবিকা সমিতির জন্যও তাঁরা মঙ্গলনিধি প্রধান করেন। উক্ত দুই ভাইয়ের বাবা গোপেশ বিশ্বাস সমস্ত আত্মীয়স্বজন এবং বরিষ্ঠ কার্যকর্তারা উক্ত মঙ্গলনিধি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

*   *   *

মালদহ জেলার অমৃতি খণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা প্রমুখ দিলীপ মণ্ডল ও জয়ন্তী মণ্ডল-এর শুভ বিবাহ উপলক্ষে গত ৮ আগস্ট বধূবরণ কার্যক্রমে মহকুমা সেবাপ্রমুখ কিরীটি শর্মা এবং জেলা প্রচারক মলয় দত্তের হাতে ৫০১ টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন।

*   *   *

বাঁকুড়া জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মণ্ডলকুলি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক রাধা বল্লভ মণ্ডল তাঁর ছোট পুত্রের পূর্ণেন্দুর শুভ বিবাহ উপলক্ষে তিন হাজার টাকা মঙ্গলনিধি বাঁকুড়া সহ জেলা কার্যবাহ তরুণ লায়েক-এর হাতে সমর্পণ করেন।

সমাবেশ সমাচার

সমাজ সেবা ভারতীর বার্ষিক সভা

সমাজ সেবা ভারতী পশ্চিমবঙ্গের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৯ আগস্ট ‘কল্যাণ ভবনে’ অনুষ্ঠিত হয়। সদস্য এবং বিশেষ আমন্ত্রিত সহ মোট ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন। ২০১২-১৩ সালের জন্য নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হলো। কার্যকরী সমিতি নিম্নরূপ :

(১) সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য— সভাপতি, (২) ডাঃ গোপাল চন্দ্র কর— সহ-সভাপতি, (৩) অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারি— সহ-সভাপতি, (৪) সন্দীপ পাল— সাধারণ সম্পাদক, (৫) পিনাকী পাল— কোষাধ্যক্ষ, (৬) ধনঞ্জয় ঘোষ— সংগঠন সম্পাদক, (৭) অলোক মুখার্জী— সহ- সম্পাদক, (৮) শিবদাস বিশ্বাস— সহ-সম্পাদক, (৯) কমল চট্টোপাধ্যায় —কার্যালয় সম্পাদক, সদস্য— (১০) লক্ষ্মীকান্ত মাইতি (১১) মনোজ চ্যাটার্জী, (১২) জয়প্রকাশ গর্গ।

ওই সভায় প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংঘচালকে অতুল কুমার বিশ্বাস।

ইন্টারন্যাশনাল মিশনের সচেতনতা শিবির

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্র সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ড্রাগের অপব্যবহার এবং বে-আইনী চোরাচালান সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, সচেতনতা, মাদকাসক্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং পূর্ণবাসন শিবির দ্যা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটির উদ্যোগে হয়ে গেল। গত ১৮ আগস্ট অসম রাজ্যের

লক্ষীমপুর জেলার নারায়ণপুর এবং 'বিচপুড়িয়া' গ্রামে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ৩২৭ জন মাদকাসক্ত নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। ২০ আগস্ট, বীরভুম জেলার 'ঈশ্বরপুর' এবং 'অমরপুর' গ্রামে আয়োজিত শিবিরে প্রায় ৩৫৪ জন মাদকাসক্ত গ্রামবাসী অংশ নেন। ২১ আগস্ট উত্তর দিনাজপুর জেলার 'সোনারপুর' এবং 'দাসপাড়া' গ্রামে শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে প্রায় ৩৭৬ জন অংশ নেন।

শিবিরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মিশনের সভাপতি কুমারী মলি বাগচী বক্তৃতা রাখেন। অন্যদের মধ্যে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব দেবাশিস ঘোষ, স্বামী সেবানন্দ গিরি, স্বামী নিত্যানন্দপুরী, ডাঃ অজিত মণ্ডল প্রমুখ।

শোকসংবাদ

পরলোকে সাধন স্বর্ণকার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও ব্যবস্থা প্রমুখ সাধন স্বর্ণকার গত ২ সেপ্টেম্বর সকালে আকস্মিক পথ দুর্ঘটনায় পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় স্বস্তিকা-র প্রচার প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করছিলেন। গত ১ সেপ্টেম্বরও স্বস্তিকা দপ্তরের সঙ্গে প্রচার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে। সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ কাজে তো বটেই, সঙ্ঘের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। স্বস্তিকা বিলি করার কাজে বেরিয়ে পথ দুর্ঘটনায় নিহত হলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন সঙ্ঘের এক নীরব কার্যকর্তা। স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুদের তিনি রেখে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে স্বস্তিকা পরিবার গভীরভাবে শোকাহত এবং শ্রীভগবানের কাছে তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছে।

* * *

মালদহ গোলাপগঞ্জ খণ্ডের সঙ্ঘের সেবা প্রমুখ ভৈরব মণ্ডলের পিতা ভীমচন্দ্র মণ্ডল গত ২৬ জুলাই পরলোকে গমন করেন।

জাতীয় পরম্পরার মেলবন্ধন রূপসাগরে অরূপরতন

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৯

—: উপন্যাস :—

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত ▯ সুমিত্রা ঘোষ ▯ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

—: প্রবন্ধ :—

আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়। ভারতবর্ষ বনাম ইণ্ডিয়া।
তিলকের প্রথম কারাবরণ ঃ শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।
রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা ।বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ। রাষ্ট্র পরিচালনায় 'খড়ের মানুষের উপদ্রব'।
গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজম। মাধেরার সূর্যমন্দির। বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা।
সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা।

—: গল্প :—

গোপালকৃষ্ণ রায় ▯ রমানাথ রায় ▯ শেখর বসু ▯ জিষ্ণু বসু ▯ দীপঙ্কর দাস ▯ রত্না ভট্টাচার্য ▯ গোপাল চক্রবর্তী

—: রম্যরচনা :—

চণ্ডী লাহিড়ী ও পিনাকপাণি ঘোষ

—: দেবীভাবনা :—

ভিক্ষুদেব ভট্ট

এছাড়াও ভ্রমণসহ আরও অনেক কিছু। সব মিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা।

সত্ত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৬০ টাকা।

রঙ্গম

'নাটক ও সঙ্গীত' বিষয়ে বক্তৃতাসভা

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

গত ১৬ আগস্ট 'শোহন' নাট্যগোষ্ঠী একটি নাট্য বক্তৃতা সভার আয়োজন করেছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিলো— 'নাটক এবং সঙ্গীত'। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত নাট্যপরিচালক এবং অভিনেতা অরুণ মুখোপাধ্যায় তিনি বলেন, যে অভিনয় করে তার সঙ্গীতজ্ঞান থাকলে সে অভিনয় আরেকটু ভালোভাবে করতে পারবে।

তাঁর মতে, মঞ্চের ওপরে গান অভিনয়ের থেকেও উঁচু মানের না হলে নাটকে গানের ব্যাবহার না করাই উচিত। কারণ, দর্শক প্রধানত অভিনয় দেখতে আসে। মঞ্চে গান যদি শক্তিশালী না হয় তাহলে দর্শকের মনে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অরুণবাবু নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, যাদের অভিনয়ে সহজাত দক্ষতা থাকে তাদের গানের দিকেও ন্যাক থাকে। যাদের তা না থাকে তাদের তা আয়ত্ত করতে হবে ভালো অভিনেতা হওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, বাচিক অভিনয়ের মধ্যেও সঙ্গীত লুকিয়ে থাকে। যদি গানকে একটু বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করি। অভিনেতা অভিনয়ের সময় প্রতি মুহূর্তেই সঙ্গীতের সাহায্য নেয়। সংলাপের মধ্যে সঙ্গীত বলতে বোঝায় মডুলেশন।

অরুণবাবুর মতে প্রত্যেকদিনের পারিপার্শ্বিকের কারণে অভিনয়ের 'স্বরলিপি' বদলে যায়। অর্থাৎ অভিনয়ের ছন্দে পার্থক্য দেখা দেয়, অনেকটা যেন গান করার মতোই ব্যাপার।

অরুণবাবু লক্ষ্য করেছেন, মানুষের নিজস্ব স্বরের মধ্যেও যেন সঙ্গীত আছে। পরিচালক বিভিন্ন স্বরের অভিনেতাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে থাকেন— অনেকটা যেন অর্কেস্ট্রার মতো। পুরো প্রযোজনারও একটি ছন্দ থাকে যা সমস্ত অভিনেতার অভিনয়ের ছন্দের সংমিশ্রণ। দুই অভিনেতার সংলাপের মধ্যে যে ছন্দ থাকে তা তৈরি করে 'পস্', যা গানেও থাকে। এটা যেন সঙ্গীতেরই প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে নাটকের অভিনয়ে। এছাড়া নাটকের গানের সঙ্গে সিকোয়েন্সের খুব যোগ এবং গানের মাধ্যমে নানা বিচিত্র নাট্যমুহূর্ত তৈরি করা যায় যদিও সব নাটকে গানকে থিয়েট্রিকালি বা নাটকীয়ভাবে ব্যবহার করা যায় না।

নাটকে সুর এবং সঙ্গীতের যে ব্যবহার হয় তার মধ্যে আবহকেও ধরা হয়, যার মাধ্যমে নানা নাট্য মুহূর্ত তৈরি হয়ে থাকে। মিউজিক একটি জোড়ালো অস্ত্র পরিচালকের হাতে নাটকের বক্তব্যকে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে। নাটকের সঙ্গে সঙ্গীতের মিশ্রণটা যথাযথ হওয়া জরুরি। কোনও গানের বাণী বা সুর যদি নাটকের জন্য জরুরি হয় তাহলে তাকে আবহ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাওয়ার মাঝে মিউজিক দেওয়া হয় যা পরের দৃশ্যের বক্তব্যকে বুঝতে সাহায্য করে। অভিনেতা দক্ষ হলে অনেক সময় আবহের প্রয়োজন না-ও হতে পারে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে, অনেক অভিনেতা আবহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন যা অভিনেতার অভিনয়ের প্রতি মনঃসংযোগে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এরকম পরিস্থিতি নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর। সবশেষে তিনি বলেন, আমাদের থিয়েটারের ট্র্যাডিশনে গানের ব্যবহার আছে। আমাদের দর্শক থিয়েটারে গান শুনতে ভালোবাসে। এরপর অরুণবাবু 'ভালো মানুষের পালা' নাটকের একটি গান গেয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

শব্দরূপ-৬৪০ রাণু ব্যানার্জী

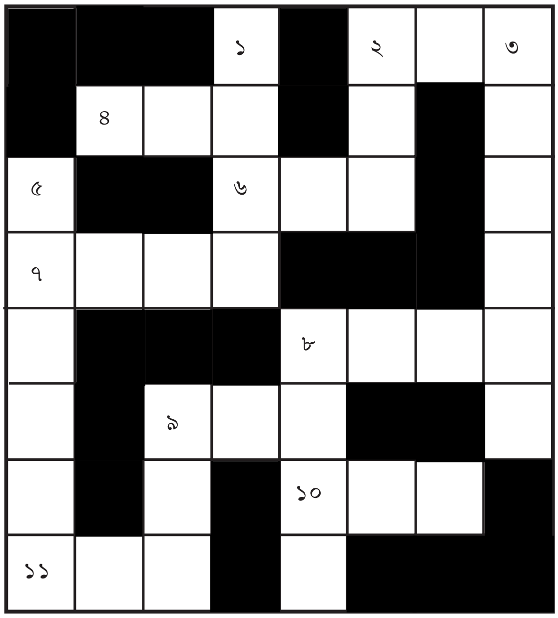

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. তৎসম অরণ্য, ৪. বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম, ৬. ''—করি দিগদিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি'' শূন্যস্থানে কম্পিত, ৭. অন্য নামে শিব, শেষ দুয়ে স্বামী, ৮. ফারসি শব্দে মাসিক বেতন, তিনে জন্মদাত্রী, ৯. গোরুর চোখের মতো ছোট বায়ু পথ, ১০. সাদা একটি মিঠাই, শেষ ঘরে জননী, ১১. বিশেষণে নাদেয়, নাদ্য।

উপর-নীচ : ১. দেবগুরু, গ্রহ-বিশেষ ২. বিস্ময়কর, অলংকারে রসবিশেষ, ৩. প্রতিশব্দে বিশেষণে অরণ্যচারী, তিনে-চারে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত, ৫. পরমেশ্বর, প্রথম তিনে সঙ্কট, শেষ তিনে নিরসন, ৮. বাবার পরিচয়ে সতী, ৯. মাতৃপরিচয়ে ভীষ্ম।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৩৭
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ঘা	ট	ছা	ড়া	নী			সু
	ঙ্ক			রু			দা
	প			জ	ম	জ	ম
তি	তি	র			ন্দ		
		ন			র	প	ট
কা	লা	পা	নি			রি	
লি			দা			পা	
ন্দী			ঘ	ট	প	টি	য়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬৪০ সংখ্যার সমাধান আগামী ১ অক্টোবর, ২০১২ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
''চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি''—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস
''ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—
B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T.''
কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।
চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা–
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।
বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।
দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।
মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা ।। মহাভারত ।। ১২

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

করিমপুর সীমান্ত চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য

সংবাদদাতা ॥ নদীয়া জেলার করিমপুর একটি সীমান্ত অঞ্চল। এই অঞ্চলটি এখন চোরাকারবারীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এদের দৌরাত্ম্যে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন প্রায় ওষ্ঠাগত। খুন, জখম, রাহাজানি দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা সরকারের মহানির্দেশক এবং অধিকর্তাদের জানিয়েও কোনও ফল পাচ্ছেন না। অনুরূপভাবে একই অবস্থা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবড়া থানার মসলন্দপুর, বসিরহাট থানার হাকিমপুর, তারালি, ঘজাডাঙ্গা, বালতি, বিশ্বাসপাড়া, নিত্যানন্দ কাঠি, আমোদিয়া, দত্তপাড়া, ইটিণ্ডা, সংগ্রামপুর এবং গোবরডাঙ্গার ঝাউডাঙ্গা, গোপালপুর, এবং বনগাঁ থানার সাহাপাড়া, বাবুপাড়া, রেলবাজার, ইটখোলা, পূর্বপাড়া, শক্তিগড়, রামনগর, মণ্ডলপাড়া, ঢাকাপাড়া, হরিদাসপুর, কালিয়ানী, ফিরোজপুর, কালপুর, ভবানীপুর, জয়ন্তীপুর, পেট্রাপোল, শিমূলতলা, মতিগঞ্জ,

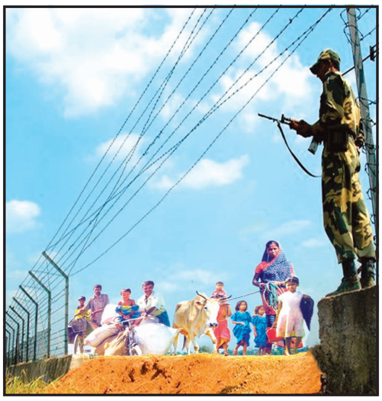

পাইকপাড়া, মেহেরপুর, রেডপাড়া, বাগদার অন্তর্গত বয়রা চোরাচালান ও সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য। এইসব সামন্ত এলাকায় প্রকাশ্যে খাঁকি পোষাকধারী এবং সবুজ পোষাকওয়ালাদের যৌথ সহযোগিতায় প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টাই গোরু, পেয়াজ, লবণ, চিনি, দুধ, প্রসাধনী দ্রব্য, কাপড়, সাইকেলের পার্টস, মশারীর থান, বিদেশী সুতো, সিলিন্ডার, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, সোনা, হেরোইন, (বর্ডার এলাকার লোকে হেরোইনকে বলে 'গুঁড়ো') প্রচুর পরিমাণে চোরাচালান হচ্ছে। সেই সঙ্গে অভিযোগ— সংশ্লিষ্ট এলাকার থানা চুক্তি ও সীমান্তে কর্তব্যরত ডি. আই. বি., রাজ্য পুলিশ ও বি. এস. এফ-এর মধ্যে চুক্তিতে অবাধে সীমান্তে তারকাঁটা ঘেরা অঞ্চল, জলপথ, স্থলপথ-এ অবৈধভাবে প্রকাশ্যে পারাপার হচ্ছে শত শত মানুষ। সেই সুযোগেই অবাধেই পার হয়ে যাচ্ছে শত শত পাকিস্তানী জঙ্গী, সন্ত্রাসবাদী। এইভাবেই সীমান্ত দিয়ে প্রায় তিন কোটি বাংলাদেশী পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ করে বহাল তবিয়তে বসবাস করে চলেছে। আমদানী ও রপ্তানীর নাম করেও সীমান্তে চলে নানা প্রকার দুর্নীতি। এল. সি-তে লেখা থাকে সার। কিন্তু যায় চিনি। এল সি-তে লেখা আছে ৫ লক্ষ টাকা কিন্তু মাল পচার হচ্ছে ৫০ লক্ষ টাকা, একে বলে আন্ডার ইনভয়েজ।

সুন্দরবনকে করিডোর করে চলছে মাল পাচার

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলো দিয়ে বাংলাদেশে চোরাই মাল পাচার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মালদা, বনগাঁ সীমান্তের মতো দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সীমান্ত দিয়েও চলে চোরাচালান। কখনও রাতের অন্ধকারে, আবার কখনও দিনে দুপুরে। ওই সামগ্রীর তালিকায় গোরু, ছাগল, থেকে আরম্ভ করে চাল, গম, চিনি, ওষুধ, রাসায়নিক সার এমনকী জামাকাপড় পর্যন্ত। আর এই পাচার চলে সুন্দরবন অঞ্চলের জলপথকে কাজে লাগিয়ে। জলপথে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। ফলে এই জলপথকে কাজে লাগিয়ে সুন্দরবনকে করিডোর করে ট্রলারের সাহায্যে মাল পাচার হচ্ছে ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে। সুন্দরবনের জঙ্গল ব্যবহার করে মাল বাংলাদেশে পাচার করার জন্য দুটি রাস্তা ব্যবহার করা হয়। একটি ধামাখালি-সন্দেশখালি হয়ে রায়মঙ্গল নদী দিয়ে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে তেরকাঠি জঙ্গল পার হয়ে বাংলাদেশে গিয়েছে। অপরটি কলকাতা- বাসন্তীরাস্তা ব্যবহার করে সড়ক পথে ঝাড়খালি। তারপর সেখান থেকে ট্রলারে করে মাল নিয়ে গিয়ে ধোপানী নদী দিয়ে হরিণ ভাঙা থেকে জঙ্গল পেরিয়ে বাংলাদেশে। বাসন্তী সড়ককে ব্যবহার করে অস্ত্রশস্ত্রও আদান-প্রদান হয় বলে জানিয়েছেন বাসন্তী থানার বাসিন্দারা। পুরো সীমান্ত জলপথে হওয়ায় নজরদারীর ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা রয়েছে। ফলে মাল পাচার সব ক্ষেত্রে আটকানো সম্ভব হয় না। এই মাল পাচার ঠেকাতে খাটুয়াবুড়িতে এবং ভুরকুণ্ডা নদীতে বি এস এফ ক্যাম্প থাকলেও এই পাচার সব সময় ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না।

এলাকার সাধারণ মানুষের কথায়, দক্ষিণ সুন্দরবনে এই মুহূর্তে পাঁচ ছয়টি পাচারকারী গোষ্ঠী সক্রিয়। এককালে এই অঞ্চলে কুলতলির মেরিগঞ্জের মধুরদল, গোসাবার লাহিড়ীপুরে বিশ্বনাথের দল, ক্যানিং-এর ডকঘাটের রেজ্জাকসর্দারের দল, বাসন্তীর ঝাউখালির কাঁটা জঙ্গলের বাচ্চু সর্দারের দল, কুলতলির হারানগাজী, পরানগাজীর দল পাচারের কাছে সক্রিয় ছিল। ২০০১ সালে পুলিসের গুলিতে রেজ্জাক মারা যাওয়ায় পাচার কাজ কিছুটা বন্ধ ছিল। আজ আবার বিপুল উদ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষের কথায়, এই এলাকার অনেক রাজনৈতিক দলের নেতাই পাচারচক্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
10 September - 2012